মিঃ তাহের বি, এ,—ইনি আমেরিকা হইতে চর্ম্ম-পরিষ্কার-করণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দেশের একটী অভাব ইহাঁ দ্বারা পূর্ণ হইবে, আশা করা যায়।

জাতীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, এন, দত্ত, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত কে, পি, গুপ্ত, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, ডাক্তার জে, এন, মিত্র, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন, ডাক্তার কে, এন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রমেশ চন্দ্র রায়, প্রভৃতি কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ মিলিত হইয়া একটী ন্যাসন্যাল মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় সভাবন্ধ—কলিকাতার প্রকাশ্য স্থলে সাধারণ সভায় বক্তারা তাঁহাদের বক্তৃতা দ্বারা জন সাধারণকে উত্তেজিত করেন এবং তাহার ফলে সহরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট একটী সার্কিউলার বাহির করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান প্রকাশ্য স্থানে দুই মাসের মধ্যে কোন সভা হইতে পারিবে না।

বঙ্গ-বিভাগ-স্মরণোৎসব—গত ৩০শে আশ্বিন অখণ্ড বঙ্গ বিভাগের দিন স্মরণার্থ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বঙ্গবাসীরা অরন্ধন ও রাখী বন্ধন করিয়া সকলের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিকতর সমারোহে কলিকাতা সহরে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বদেশী পোর্সিলেন—আমরা অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, জাপান হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুত সত্যসুন্দর দেব দেড় বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি মহোদয়গণের সাহায্যে কলিকাতা সহরে ৪৫ নং টাঙ্গরা রোড, বেলেঘাটায়, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনা মাটীর বাসন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার কারখানায় নির্ম্মিত চার পেয়ালা, ডিস, পুতুল, বাটী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে কোন অংশে বিলাতী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এই উদ্যমশীল যুবকের ঐকান্তিক যত্নে ভারতবর্ষে এইরূপ কারখানা এই প্রথম স্থাপিত হইয়াছে।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা কঠিনরোগে ভুগিতেছিলেন, গত ২৩শে আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দয়াময় শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিদান করুন।

প্রসিদ্ধ 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় অন্তর্বৃদ্ধি রোগে অস্ত্রচিকিৎসায় ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে ১০ই কার্ত্তিক দেহত্যাগ করাতে এ সময় দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। স্বদেশি-মাত্রেই এই দুর্ঘটনায় শোকার্ত্ত।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে।

১

পিতৃহীনা তুই আজ কাঁদি "বামাবোধিনী",
আজি তোর জন্মোৎসব কোথায় হায় তিনি।
অতুল স্নেহের ভরে, তোর ঐ কলেবরে,
কতই ভূষণ দান করেছেন যিনি,
কোথায় কোথায় আজ সে স্নেহের মণি।

২

পিতৃহীনা তোর দুঃখে কাঁদি "বামাবোধিনী."
আজি তোর জন্মোৎসব হায় কোথায় তিনি।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, আনিতেন হাত ভরি
সুন্দর বসন কত ধর্ম্ম আভরণ,
দেবসম সেই পিতা কোথায় এখন।

৩

পিতৃহীনা তুই আজ ওলো "বামাবোধিনী,"
কোথায় তিনি যার এত ছিলি আদরিণী।
যিনি প্রাণপাত করে, তব দেহ অকাতরে,
সাজাতেন, হায় তিনি শ্মশানে শায়িত!
আমরা বিহ্বলে কাঁদি শোকাকুলচিত।

৪

পিতৃহীনা তোর তরে কাঁদি "বামাবোধিনী",
কোথায় আজ লুকালেন সে জ্ঞানের খনি।
"নারীরা" পুরুষ সম, নহে কিছু খর্ব্বতম,
তাহারা যে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,
এই শুভ সমাচার বলেছেন তিনি।

৫

পিতৃহীনা তোর তরে কাঁদি "বামাবোধিনী,"
সেই মহা উদারতা ঢেকেছে এ ধরণী।
"হুহিতৃ"-রতন বলে, রাখিয়া স্নেহের কোলে,
এত কাল তোকে দিয়া জ্ঞানের ভূষণ,
করেছেন দেবদেশে দেবতা প্রয়াণ।

৬

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী"
আদরে পালিব তোকে এতগুলি ভগিনী।
স্বরগ হইতে তিনি, দিবেন আশীষ-বাণী,
নবীন জীবনী তোকে তাঁরি বলে দিব,
মরিতে দিব না তোকে যতনে রাখিব।

৭

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী"
আমরা দিতে যে চাহি তোকে নব জীবনী।
পিতৃহীনা হয়েছিস্, বিধাতার শুভাশীষ,
আসিতেছে শিরে তব, কেঁদনা দুখিনী,
দিতে চাহি মোরা তোকে নবীন জীবনী।

৮

কেঁদোনা দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী,"
দেখ তোর জন্য কাঁদে এতগুলি ভগিনী।
আমরা অতীব ধন্যা, দেবের মানস-কন্যা,
তোকে কি লো অনাদরে ফেলিয়া রাখিব,
অকালে নিঠুর হাতে মরিতে কি দিব?

৯

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী,"
তোকে ঘিরে আছে দেখ এতগুলি ভগিনী

জ্ঞানের ভূষণ ল'য়ে সমাদৃত হ'য়ে
নারীর প্রতিভা তুই করলো প্রচার,
দেখিয়ে ঘুচুক মোর সব "হাহাকার"।

১০

ভুলিব না দেবতার সেই যে শেষ বাণী
বলিলেন তোরতরে ওলো "বামাবোধিনী"
যত দিন ভবে রব, কিসে তোকে সাজাইব,
এই চিন্তা লক্ষ্য মম শোনলো দুঃখিনী,
কি দিব আমি তোকে ওলো "বামা-
বোধিনী"।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

বল্লুজী চম্পাবৎ।

(৫৩০ সংখ্যা—১৭২ পৃষ্ঠার পর)

ইহা শুনিয়া রাও অমর সিংহ বল্লুজীকে ডাকিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"দেখুন! এখন আমার কোন যুদ্ধের কাজ উপস্থিত নাই, কারণ দিল্লীর সম্রাটের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। এখন আমার পার্শ্বে যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমার ছাগলের পাহারা দিতে হইবে।"

"বটে! যত দিন আপনার বিপদ থাকিবে ততদিন আমি আপনার সহিত থাকিব বলিয়া সত্যবদ্ধ হইয়াছিলাম। আপনি এখন সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন, মানুষ ও ছাগলের শাসন করিতেছেন, এখন আর আমার সহায়তার আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি সুখে থাকুন।"

ইহা বলিয়া বল্লুজী বিকানীর গমন করিলেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তা কর্ণ সিংহ তাঁহার ন্যায় একজন সুযোগ্য পারিষদ পাইয়া সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু বিকানীরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার আগমনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং কি প্রকারে তাঁহাকে বিতাড়িত করিবে তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এক দিন মহারাজা তাঁহার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে "মাতিরো" নামক একটী উৎকৃষ্ট ফল উপহার প্রেরণ করেন। ইহাতে একজন বন্ধুবেশী ব্যক্তি বল্লুজীর কাণে কাণে বলিল—

"দেখুন, আমাদের এখানে এই ফলটীকে "মৎরহো" বলে; ইহার অর্থ কি জানেন ত? "মৎ—রহো"—আসিও না। মহারাজার এই ফলটী প্রেরণের উদ্দেশ্য তিনি আপনাকে প্রকারান্তরে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন, কারণ প্রকাশ্যে তিনি এরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন না।

অভিমানী বল্লুজী এই কথা বিশ্বাস

করিয়া সহসা ঘোড়ায় চড়িয়া বিকানীর ছাড়িয়া গেলেন। মহারাজা তাঁহার এই আকস্মিক গমনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তিনি যে বিদায়ও লইয়া যান নাই এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

বল্লুজী উদয়পুরে গমন করিলেন। সেখানে আবার মহারাণার সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সেখানেও আবার অন্যে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। একদিন তিনি মহারাণার সহিত সিংহশিকারে গমন করিলেন। একজন সভাসদ্ মহারাণার কাণে কাণে বলিল,—"এই যে চম্পাবৎকে দেখিতেছেন, ইনি ইঁহার বীরত্বের বড়ই গর্ব্ব করেন। ইনি শুধু একখানি কুঠারি হস্তে একাকী একটী সিংহের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন।"

"বটে? ইহা যোদ্ধার উপযুক্ত খেয়াল। তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, করুন।"

রাণার কথা শুনিয়া সভাসদ্ বল্লুজীর নিকটে গিয়া হাসিমুখে বলিলেন,

"মহারাণা আপনাকে একটী প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় সাহসের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি কেবল একখানি মাত্র কুঠারি লইয়া একটী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে বধ করুন।"

বল্লুজী অবিচলিত-চিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

তিনি একাকী একটী জঙ্গলের পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটী সিংহ বন হইতে তাড়িত হইয়া সেই পথে আসিল। সে যখনই দেখিল একটী রাজপুত তাহার পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, অমনি সে গর্জ্জন করিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, সেই শিকারের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া বসিয়া লম্ফ প্রদান করিল। বল্লুজী খুব সতর্ক ছিলেন; তিনি অমনি সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যখনই সেই সিংহ তাঁহার পার্শ্বে মাটিতে পড়িল, অমনি তিনি তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই মৃত পশুকে সেখানে রাখিয়া তিনি মহারাণার নিকটে গিয়া বলিলেন,—

"মহাশয়! আমি এই সাহস ও যুদ্ধকৌশলের যে পরীক্ষা দিলাম, ইহাতে আপনার কি লাভ হইল? যদি সিংহ আমাকে মারিয়া ফেলিত, তবে আমিই মরিতাম, অথচ তাহাতে আপনার কিছুই লাভ হইত না। যে সব বর্ব্বর রাজা একজন রাজপুতের জীবন ও একটী মোরগের জীবন সমান মূল্যবান্ জ্ঞান করে, এ সব খেলা তাহাদেরই সাজে। কিন্তু আপনি হইতেছেন আর্য্যকুল-রবি—একজন রাজপুতের জীবনের মূল্য কি তাহা আপনার বুঝা উচিত। আমাদের জীবন আপনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—আপনার সিংহাসন রক্ষার জন্য বিনষ্ট হওয়াই সঙ্গত,—কিন্তু আপনার ক্রীড়াকৌতুকের জন্য নহে।"

গর্ব্বিত রাণা ইহার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যে মনে করিয়াছিলেন,

বপ্পজী নিজেই তাঁহার সমরকৌশল ও সাহস প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহাতে বপ্পজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি রাজপুত রাজাদিগের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই নিজের ভাবী উন্নতি কামনায় দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট গমন করিলেন।

দিল্লীতে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। সেখানে তিনি পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হইয়া কিছুকাল বাস করিলেন। তাঁহার দিল্লীতে অবসর ভোগ করিবার সময়, একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী উদয়পুরে আসিল। তাহার সঙ্গে যে সব অশ্ব ছিল, তাহাদের মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণের ঘোটক বড়ই উৎকৃষ্ট—সেরূপ ঘোটক সচরাচর দেখা যায় না। মহারাণা অন্যান্য ঘোটকের সঙ্গে সেটীকেও কিনিলেন।

মহারাণা তাঁহার সামন্তদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বলুন দেখি, এই সর্ব্বোত্তম ঘোটক-টীতে আরোহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কে?"

সামন্তগণের মধ্যে কেহ একজনের নাম করিলেন; আর একজন অন্য ব্যক্তির নাম করিলেন।

মহারাণা বলিলেন "না—আপনারা কেহই ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। এক বপ্পজী চম্পাবৎ ভিন্ন কেহই এই অশ্বে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।"

ইহা বলিয়া তিনি বপ্পজীর নিকট একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিয়া সেই ঘোটক প্রেরণ করিলেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—"হে বপ্পজী! আপনি ভিন্ন এই অশ্বের উপযুক্ত আরোহী আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনি আমার প্রীতি উপহার স্বরূপ এই অশ্বটীকে গ্রহণ করুন।"

ইতিমধ্যে আগরাতে অনেক কুকার্য্য ঘটিয়াছিল। নাগোরের অমর সিংহ ও বিকানীরের মহারাজার মধ্যে তাঁহাদের রাজ্যের সীমা লইয়া গোলযোগ বাধিয়া-ছিল। তাহাতে উভয়পক্ষ মোগল সম্রাটের নিকট সেই বিবাদমীমাংসার জন্য প্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ সলামত খাঁকে সালিস নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইনি বিকানীরের অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিয়া অমর সিংহের অর্থ দণ্ড করেন। পরে একদিন দরবারের সময় সলামৎ খাঁ অমর সিংহকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সেই জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই। ইহাতে অমর সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমি কেবল ঢাল ও তরবারী দ্বারা তাহা শোধ করিব।"

সলামৎ খাঁ নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অমর সিংহকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিলেন। অমর সিংহ তরবারী নিষ্কাসিত করিয়া তখনই সম্রাটের সিংহাসনের পার্শ্বে,

তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাতে সাহজাহান অমর সিংহকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। ক্রোধোন্মত্ত অমর সিংহ অমনি তাঁহার শোণিতসিক্ত অসি সাহজাহানের প্রতি উঠাইলেন। সম্রাট্ সরিয়া পড়িলেন; তাঁহার পারিষদ্ সামন্তগণ অমরসিংহকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিলেন না। অমরসিংহ তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া তরবারি চালনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং একে একে তাঁহাদের পাঁচজনকে সলাবৎ খাঁর সঙ্গে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তিনি নিরাপদে তোরণদ্বারে পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদিগকে লইয়া দুর্গের দিকে পদব্রজে গমন করিলেন। তাহার নিকটে তাঁহার শিবির ছিল। যে সকল লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে তাঁহার শ্যালক অর্জ্জুন গোদা ছিল। এ লোকটী নিতান্ত দুর্জ্জন ও বিশ্বাসঘাতক। দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়া অমর সিংহ দেখিলেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র দ্বার মাত্র খোলা আছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কেবল তাঁহার নিজ পক্ষের লোকই তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছে। তাই তিনি দুর্গপ্রহরীকে ডাকিবার জন্য সেই ক্ষুদ্র দ্বারে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এই সময়ে সেই অর্জ্জুন গোদা তাঁহার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহার মতলব ছিল, এইরূপ করিয়া সে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিবে; কিন্তু তাহার সেই আঘাতে যে তাহার নিজ সহোদরা বিধবা হইলেন, এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না।

এই হত্যার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার ছয় জন অনুচর সেই মৃত ব্যক্তির হস্তে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তিনি হুকুম দিলেন—"অমর সিংহের মৃত দেহ এই দুর্গের মধ্যে থাকুক; কাক ও শকুনির পাল আসিয়া তাহা ভক্ষণ করুক; উহার অগ্নি-সংকার করা হইবে না।" অমর সিংহের বিধবা পত্নী রাণী হাড়ীর নিকট তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিলে, তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভাঁজী কুম্পাবতের নিকট আদেশ পাঠাইলেন,—"যে প্রকারেই হউক, আমার স্বামীর মৃতদেহ আমার নিকট আনয়ন কর; আমি সহমৃতা হইয়া তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হইব।"

ইহা শুনিয়া ভাঁজী পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন। আগরা দুর্গ সুরক্ষিত ও দুর্জ্জয় জানিয়া তিনি বল্লুজীর নিকট এইরূপ লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,—"হে মহাপ্রাণ রাজপুত! বলুন দেখি, যতক্ষণ ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে এই পৃথিবীতে জীবিত রাখিয়াছেন, ততক্ষণ মৃত মহাত্মার সহিত যুদ্ধপরায়ণ সম্রাটের নিষ্ঠুর আজ্ঞায় অমর সিংহের মৃত দেহ শুদ্ধিসংকারবিহীন

হইয়া যে শকুনির আহারের জন্য পরিত্যক্ত হইবে, ইহা কি নিতান্ত লজ্জার বিষয় নহে? আমাদের রাণী মহীয়সী হাভীজী তাঁহার স্বামীর সহিত স্বর্গারোহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমি একাকী, তাই আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, এ জন্য কিছু মনে করিবেন না।”

(ক্রমশঃ)

রামায়ণের কথা।

সেপ্টেম্বর মাসের Fortnightly Review নামক পাক্ষিক পত্রে কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বালিকাবস্থায় তাঁহার মাতা শয়ন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভারতবর্ষীয় গল্প শুনাইতেন। গল্প প্রায় রামায়ণের কথা লইয়া হইত। বিলাতী ওক, এলম্ ও উইলো বৃক্ষের পরিবর্ত্তে এদেশীয় নিম্ব, অশ্বত্থ, শাল, তাল, আম্র ও কদলীর কথা পাড়িতেন। ক্রমে বন, উপবন ও তপোবনের বর্ণনা হইত। বাল্মীকির আশ্রমে ইতর প্রাণিগণের মধ্যে সদ্ভাবের কথা বলিতেন। ঋষিকে সকলে সম্মান করিত। না দেখিয়া ঋষি পাছে সর্পের উপর কিম্বা বিষাক্ত লতার উপর পদ বিক্ষেপ করেন, এই আশঙ্কায় খদ্যোত-পুঞ্জ নিজ নিজ ক্ষুদ্রালোক প্রদান করিত। প্রাণিহিংসা করি বলিয়া ঋষি আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন এই ভাবিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে থাকিত। তাঁহার পদসঞ্চার শুনিয়া কুসুমিতা লতাগুলি প্রেম-ভরে তাঁহার কুশল সংবাদ লইত। মৃদু হিল্লোলে আকম্পিতা কোন বন-লতা তাঁহাকে যেন এই বলিয়া সম্ভাষণ করিত,—“ঋষি ঠাকুর! আজ তোমাকে পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, তোমার ত কোন অসুখ করে নাই? আমার এই পুষ্প গ্রহণ কর, ইহার সুস্নিগ্ধ সৌরভে তোমার শ্রমাপনোদন হইবে।” মাতা বলিতেন, ঋষির আশ্রম শান্তিময়। আশ্রমের চেতন অচেতন সকল পদার্থ হইতে এক অপূর্ব্ব প্রেম উচ্ছসিত হইত। আশ্রমবাসীরা সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃষের দুর্দ্দান্ত ভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাদের পরাক্রমের ব্যাখ্যা করিতেন ও তাহাদের সহিত বীর-পুরুষদিগের উপমা দিতেন। নরসিংহ, নরশার্দ্দূল, নরর্ষভ এই সকল শব্দ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতেন। অবিবেকিতা বশতঃ কিম্বা নিষ্ঠুরতাপরতন্ত্র হইয়া কোন জীবের প্রাণসংহার না করা কিম্বা তাহাকে শারীরিক কোন কষ্ট না দেওয়া—ইহাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে দশরথ-পুত্র সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রই সর্ব্বজীবের বন্ধু বলিয়া খ্যাত; ইতর প্রাণিদিগকেও তিনি সোদর তুল্য দয়া করিতেন। কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। তিনি

বলিতেন যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে অনেক দয়ার্দ্রচিত্ত গুণশালী আছে—এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেক বিক্রমশালী বীরও আছে। সীতার উদ্ধারের জন্য জটায়ু প্রাণদান করিলে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পরদুঃখে দুঃখী এই পক্ষী নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিবে।" এইরূপ সর্ব্বজীববন্ধু রামচন্দ্রের কত কথা কহিয়া মাতা আমাদিগকে ঘুম পাড়াইতেন।

ধন্য ইংরাজমহিলা! ঘরে অন্ন থাকিতে আজ আমরা ভিখারী, কয়জন বঙ্গমহিলা স্তন্যের সহিত তাঁহাদিগের শিশু সন্তানদিগকে রামায়ণের পাবনী কথা শিখাইয়া সাধু চরিত্রের বীজ বপন করেন?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

একটী ছাত্রের পত্র।

পরম পূজাপাদ সাধক-প্রবর *

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীচরণেষু—

টোড়ি ভৈরব—জলদ একতালা।

তুমি হাতে ধ'রে লয়ে যাবে
তাঁর কুশল-সন্নিধানে,—
দেব, বড় আশা ছিল প্রাণে।
দারুণ পিপাসা লইয়া বক্ষে,
মঙ্গল চরণ হেরিতে চক্ষে,
ফিরে গেনু আজি দুয়ারে আসিয়া
বড় দুখে, অভিমানে।

পবিত্র এই মন্দিরে তব, করিনু রাত্রিবাস
হে;
বুঝিলাম ধ্রুব, তাঁহারি প্রেরিত, নিয়তির
পরিহাস হে;
হ'ল না তোমার চরণকিরণে, প্রাণের
আঁধার নাশ হে;

---

* লেখক একজন কৃতবিদ্য উকিল। ইঁহার লিখিত অনেকগুলি সুন্দর সঙ্গীত-পুস্তক আছে। ইনি কোন সময়ে মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন; কিন্তু স্বর্গগত সম্পাদক মহাশয় তখন অন্যত্র যাওয়াতে তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া এই পত্রখানি লিখিয়া রাখিয়া যান। বা, বো, স।

অন্ধ বলিয়া হাত ধরে কেহ নিলনা তাঁহার পানে।
ব্যাকুল হইয়া এসেছিনু দেব, করিতে সাধুসঙ্গ,
ধর্ম্ম-কথায় জুড়াতে আমার তাপিত হৃদয়, অঙ্গ,
প্রাণের দেবতা পাঠাইয়া দিল দারুণ ভরসা-ভঙ্গ,
নারিনু জুড়াতে এ আকুল হিয়া উপদেশ-সুধা-পানে।
তুমি নাকি তাঁরে পেয়েছ, শুনিয়া, এসেছিনু তব দ্বারে,
তুমি নাকি পার অন্ধ দীনে লয়ে যেতে পর পারে;
মলিন প্রাণের তীব্র বেদনা জানাইব দেব! কারে?
কাটাইনু আজি আঁধার যামিনী, শুধু, বিভু-গুণ-গানে।
রাখিয়া গেলাম তোমার চরণে ব্যাকুল প্রাণের চিত্র;
কায়মনে দেব, করি নাই তব মন্দির অপবিত্র;
পার্শ্বে বসিয়া দ্বিজেন বালক, আজি সে পরম মিত্র;
উদ্দেশে বিদায় লইলাম, দেব, অশ্রুভরা নয়নে।

একান্ত দর্শনপিপাসী ছাত্র
শ্রীরজনীকান্ত সেন।

আর্য্যদিগের রন্ধন-শাস্ত্র।

কোন প্রাচীন সভ্য জাতির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে যে যে বিষয় অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের খাদ্যবস্তু ও রন্ধনপ্রণালী একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। যে যে দেশের লোকেরা অর্দ্ধপক্ক, অর্দ্ধদগ্ধ, দুর্গন্ধ, শুষ্ক ও পর্য্যুষিত মাংসাদি ভক্ষণ করিত, তাহারা যে প্রাচীনকালে ঘোরতর অসভ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল জাতির মধ্যে ঐরূপ খাদ্য-ভক্ষণ-প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত সুতরাং উৎকৃষ্টভাবে রসনার পরিতোষকর ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহারা যে প্রাচীনকালে কত সভ্য ছিল, তাহা কি আর বলিতে হয়?

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যখন যে বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, তখন তাহার চরম উন্নতি না করিয়া ছাড়িতেন না। বিবিধ দর্শন, বিবিধ সংহিতা, বিবিধ কাব্য, বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ, বহু জ্যোতিষ পুস্তক প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে মনীষাসম্পন্ন তত্ত্বানুসন্ধানবিৎ আর্য্যগণ বহু তত্ত্বানুসন্ধানে ও বহুশাস্ত্রপ্রণয়নে তৎপর ছিলেন, তাঁহারা যে মানবজাতির তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের

উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করণ কার্য্যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। সংসারে সকলেই প্রধানতঃ পেটের দায়ে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করে। সকলেরই ইচ্ছা রসনার তৃপ্তিকর বিবিধ প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে। কোন কোন খাদ্য সুস্বাদ না হইলেও বলকারক ও পোষণোপযোগী হইতে পারে; সুতরাং সেরূপ খাদ্যেরও উপযোগিতা না আছে এরূপ নহে। কিন্তু রুচিকর খাদ্যেই মানবগণের স্পৃহা অতি বলবতী। সভ্যজাতির বিবিধ ঐহিক সুখ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই যে উৎকৃষ্ট সুরুচিকর ভক্ষ্য পদার্থের উৎকর্ষবিধায়িকা রন্ধনবিদ্যার উন্নতীচ্ছা প্রবলা হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভগবতী অন্নপূর্ণা এ দেশের রন্ধনবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিখ্যাতা। স্ত্রীলোকদিগের যে উৎকৃষ্ট রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক এবং স্ত্রীর হস্তে পাক করা অন্ন ভক্ষণে যে স্বামীর অত্যধিক তৃপ্তি হয়, তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্যই বুঝি ভারতীয় প্রকৃতিদেবী অন্নপ্রদান-নিরতা ও ভবত্রঃখহন্ত্রী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিবকে অন্ন দিয়াছিলেন। দেবী সেই অন্নদারূপে অবতীর্ণ হইয়া আপন সন্তান জগদ্বাসী জীবদিগকে অন্ন প্রদান করিয়া জগদম্বা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালের অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ত্তমান ভারতের সভ্যানামবিশিষ্টা প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিদেবী অন্নপূর্ণার আদর্শ গ্রহণ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। এক্ষণে রন্ধনবিদ্যা জঘন্য পাচকবৃত্তি বলিয়া অধিকাংশ ভদ্ররমণীদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। পল্লীগ্রামেও সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদিগের গৃহ হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাক-করা-প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে হিন্দু রমণীগণের নিকট হইতে রন্ধনবিদ্যা হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে এতদ্দেশীয়দিগের দেহপুষ্টি, নীরোগিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তিরোহিত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে।

আমাদের প্রাচীন সংহিতাকারক বলেন—

"পিতৃবন্তঃপুরে দদ্যাৎ মাতৃর্দদ্যাৎ মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ পিতৃতুল্য ভক্তিবিশ্বাসভাজনের হস্তে অন্তঃপুররক্ষার ভার দিবে; মাতৃতুল্যা স্নেহময়ীর হস্তে রন্ধনশালার ভার দিবে; গোসেবায় আত্মতুল্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে এবং কৃষি বা বিষয় কর্ম্ম স্বহস্তেই সম্পন্ন করিবে। যাহার উপর সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য,জীবন ও পরিতৃপ্তি নির্ভর করে, সেই কার্য্যটী যে কিরূপ পবিত্র, মঙ্গলকর ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাককার্য্যে ভূরি ভূরি বহুমূল্য মসলা প্রদান করিলেও তাহা পবিত্র, স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিজনক হয় না। পাকের সর্ব্বপ্রধান নিগূঢ় মসলা হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ। জননী বা জননীতুল্যা স্নেহময়ীর হস্ত ভিন্ন অন্য কাহারও

নিকট এ দিব্য মসলাটির আশা করা যায় না।

পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নে এবং পাচক ভৃত্যের কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নে অনেক ইতর বিশেষ আছে। ভৃত্যের সম্বন্ধ ভৃতির সহিত, আর পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ জীবনের সহিত। স্বামী, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতির কিরূপ খাদ্য রুচিজনক, পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ হয়, তৎপক্ষে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ যত্ন থাকিতে পারে, অশিক্ষিত ও বেতনমাত্রলক্ষ্য পাচক পাচিকা বা ভৃত্যের তাহা থাকিবে কেন? কোন রূপে পাক করিয়া দিয়া দিন কাটিয়া গেলে, ক্রমশঃ মাস কাটিয়া গেলে বেতন পাইলেই তাহাদিগের হইল। প্রস্তুত করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি অসৎসংস্পৃষ্ট হইলে, বিড়াল কুক্কুরাদিতে উচ্ছিষ্ট বা নষ্ট করিলে বর্ত্তমান পাচক মহাশয়গণ, প্রভু-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবার ভয়ে তাহা প্রকাশ করে না। একে কুৎসিতরূপে প্রস্তুত, আবার স্থলবিশেষে দ্রব্যান্তর-সংসর্গে দূষিত সেই অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিলে পীড়ার আক্রমণ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। পাচকদিগের অপকৃষ্ট রন্ধনে গৃহস্থের রন্ধনোপকরণ ব্যয় অনর্থক হয়, পাচকদিগের বেতনে ও খোরাকে ব্যয় হয় অথচ অসংস্কৃত ও অবিশুদ্ধ অন্নাদি ভক্ষণজনিত ব্যাধির চিকিৎসাতেও ব্যয় হয়। যে সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থের গৃহিণীরা রন্ধন করিতে জানেন না, অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এক দিন পাচক মহাশয় কৃপা না করিলে, চেষ্টা ও সাধাসাধনা করিয়া আফিসে ও বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যাইবার পূর্ব্বে ঠিকা ঠাকুর পাকের জন্য পাওয়া না গেলে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে দোকানের সেই চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে প্রস্তুত ও পর্য্যুসিত লুচি, কচুরী প্রভৃতি খাইতে হয়। এইরূপ খাদ্য ভক্ষণে শরীরের বল, স্বাস্থ্য সুতরাং সুখও যে নষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

আমি এরূপ বলিতেছি না যে, পূর্ব্ব-কালের রন্ধনশাস্ত্র পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না, এবং সূপকারগণ রন্ধন করিতেন না। রন্ধনবিদ্যা অতি আদরণীয় বিষয় বলিয়া বিখ্যাত নৃপবংশীয় পুরুষ-গণের মধ্যে অনেকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তৎকালে গুণবান্ পাচক ও সূপকারগণ বিখ্যাত নৃপালয়সমূহে রন্ধন করিতেন। ইঁহারা পরিষ্কৃত দেহ, চিকিৎসাবিদ্যানিপুণ, ও পবিত্রাচারসম্পন্ন ছিলেন। নৃপালয় ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভবনে পাচক ছিল কি না, তাহার ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুণবান্ পাচককে বেতন দিয়া রাখা ব্যয়সাধ্য বলিয়াই হউক, পাচক ভৃত্য প্রাপ্তির সুবিধা সর্ব্বত্র থাকিত না বলিয়াই হউক, আত্মীয়-স্ত্রীলোকদিগের পাক-করা অন্ন প্রীতিকর ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক বলিয়া পাচকদিগের প্রতি অনাস্থাবশতই হউক, প্রাচীন হিন্দু-

সমাজে ঘরে ঘরে এরূপ পাচকের বাড়াবাড়ি ছিল না। কেবল নৃপালয়েই পাচকের স্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজভবনে গুণসম্পন্ন কতকগুলি পাচক পাক করিতেন, সর্ব্বোপরি এক জন সূদাধ্যক্ষ থাকিয়া সম্ভবতঃ সেই গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইহা ভিন্ন পরিবেশক পুরুষ ও পরিবেশিকা স্ত্রীলোকও যথেষ্ট ছিলেন। উক্ত পাচকাদির লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নে কতিপয় শ্লোক প্রমাণস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥
(চাণক্যসংগৃহীত শ্লোকমালা।)

অনুবাদ। যিনি ইঙ্গিত ও আকারের তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ যিনি লোক দেখিয়া বা লোকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিরূপ খাদ্য তাহার স্বাস্থ্যোপযোগী ও রুচিকর হয় তাহা বুঝেন এবং রন্ধনোপকরণ ও রন্ধননিষ্পন্ন অন্নাদি দেখিয়া তাহার গুণাগুণ বুঝিতে পারেন, যিনি বলবান্ অর্থাৎ রন্ধনোপযোগী শারীরিক-বলসম্পন্ন অতএব নীরোগদেহ, যিনি সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে পারেন, যিনি বীর অর্থাৎ নীচমনা ও অলস নহেন এবং যিনি সুদৃঢ়দেহ, এইরূপ সদ্‌গুণনিচয়সম্পন্ন মহাত্মা সূপকার বলিয়া কথিত হন।

অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাম্বরঃ।
সূদশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ স উচ্যতে॥
(মৎস্যপুরাণম্।)

অনুবাদ। অনাহার্য্য (যাঁহাকে শত্রুগণ পরামর্শ দ্বারা বিগড়াইতে না পারে অথবা যাঁহাকে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,) পবিত্র, স্বকার্য্যে দক্ষ, চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ, পাকশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি সূদাধ্যক্ষ অর্থাৎ পাকশালাধ্যক্ষ বলিয়া কথিত হন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষ।

রে বর্ষ!
আজি তোর চক্র ঘুরে এল ধরা,
রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ তারা;
আমি চেয়ে আছি সেই পথখানি,
গিয়াছে যেথায় মোর যাদুমণি।
হঠাৎ সেদিন প্রথম রাতে,
যেথায় গিয়াছ ফেলিয়া আমায়,
আজও বসে আছি সেই কিনারায়,
কত না তরঙ্গ লাগিতেছে গায়,
বালুকার কণা আঁখিতে ছড়ায়,
বেঁচে আছি দেখ সহস্র আঘাতে।
কতনা ঝটিকা কতই তুফান,
বিদারিয়া মোর হৃদয়বিমান,
বহিছে সঘনে সারা দিনমান,
বিষাদ-জলদে চপলার বাণ
করেছে জীবন মুমূর্ষু প্রায়।

মাস বর্ষ তিথি ঘুরে ফিরে এলে,
তোমারে কে ডাকে ভাসি আঁখিজলে,
কার হা হুতাশ পড়ে পলে পলে,
কোন প্রাণ সদা অনির্ব্বাণ জলে,
দশানন চিতা রাক্ষস ধরায়।

হায়রে উন্নত অজ্ঞান হৃদয়
বলে আছ তুমি লইয়া আশয় ;
পাবে কি সান্ত্বনা কর কি সংশয় ?
বরষের পরে বর্ষ হবে শুধু লয়,
তোমার এ পাষাণ জীবন পরে।

নিশি দিবা মাস বর্ষ আসে ঘুরে,
অনলে অনল নিভিলে উগারে,
বিয়োগে সংযোগে স্থষ্টি বদ্ধ হেরে,
যাতায়াতে এই মহীচক্র ফিরে,
অহরহ খেলে অবনীভিতরে।

কিন্তু হায় কই সে সুন্দর চিত্র
পশে না নয়নে বড়ই বিচিত্র !
যারে ডাকিতেছি প্রতি অহোরাত্র
ইষ্ট মন্ত্র সম মরম-আগারে।

যতদিন রবে এ দেহে পরাণ,
অতীতের স্মৃতি রবে বর্ত্তমান,
সংসারের ভূমে বসি জপি নাম,
শত কোলাহলে না হয় বিরাম,
হৃদয়তন্ত্রী আপনি বাজে রে!

আহা রে বিধাতা ! আহা রে বিধান !
নিঠুর হইয়া হানিলে কৃপাণ,
দিলে ঘোর শিক্ষা হলো নাক জ্ঞান,
হবেনাক কভু বুঝি পরিত্রাণ,
পড়িয়া বিঘোর আঁধার-মাঝারে।

বারমাস আজি কাটিল ধরায়,
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব চলে যায়,
নয়নের নীর তবু না শুখায়,
এ বুঝি বন্ধন তোমায় আমায়,
তাই বহে স্রোত অন্তরে অন্তরে।

হে স্থষ্টিনিয়ন্তা ! কর হে খণ্ডন,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে করি নিবেদন,
অকালে কলিকা করোনা ছেদন,
এ মহা কলঙ্ক যাবেনা কখন,
নিত্য কত প্রাণ কাঁদে কাতরে।

অনন্ত এ ভাষা ফুরাবে না কভু
হে অন্তরযামি ! জানিতেছ প্রভু !
যাতনাপীড়িত করি উহু হু
রুধির ঝরিছে প্রতিমুহূর্মুহু
খুলে দেখ বুক বিনতি তোমারে।

বরষের পরে আজি সেই দিন
দিয়া গেছে বক্ষে অশনির চিন্,
সহস্র কণ্টকে বিঁধে করে ক্ষীণ,
ধেয়াতেছি আমি তবু নিশি দিন
আমার প্রাণের নন্দন সুতেরে।

ওহে দেবদেব ! ধন্য ধন্য তুমি !
তীব্র বহ্নিরূপে মম শোক-ভূমি
করিতেছ দগ্ধ ওহে বিশ্বস্বামী !
সকাতরে তাই কেঁদে কেঁদে নমি
কবে ফিরে পাব লয়েছ যাহারে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সদ্যোজাত শিশুদিগের রোগনির্ণয়।

(৫২৯ সংখ্যা—১৩৯ পৃষ্ঠার পর ।)

বমি ও মল দেখিয়া রোগনির্ণয়।

সচরাচর শিশুকে অধিক দুগ্ধ খাওয়াইলে বমি হয়। এ অবস্থায় দুগ্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ দুগ্ধ ছানার মত হইয়া যায় না। সর্ব্ব প্রকার পরিপাকযন্ত্রের পীড়ায় বমি হয়। অনুপযুক্ত আহার করিলে বমি হয়। অজীর্ণ রোগে বমি হয়। মস্তিষ্কের পীড়ায় বমি হয়; মস্তিষ্কের পীড়া হইলে শিশু আহার একবার মাত্র করিতে চায়; এ রোগে বমি ক্রমাগত হইতে থাকে। ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর সর্ব্ব প্রকার কণ্ঠজ্বরে বমি হইতে পারে। ফুস্ফুসের পীড়ায় বমি হয়। হুংড়ি কাশীতেও বমি হইতে পারে।

মলের বিষয়।

সাধারণতঃ শিশুদিগকে অধিক দুগ্ধ খাওয়াইলে, ক্রিমি থাকিলে ও দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময় রোগ হইতে দেখা যায়। সচরাচর শিশুদের মল দেখিতে কাল, সবুজ ও আটাযুক্ত হয় এবং তাহাতে ঘাসের গন্ধ থাকে; অবশেষে মল পীতবর্ণ অথবা দধির মত রং বিশিষ্ট হয় এবং তাহাতে কোন গন্ধ থাকে না।

শিশুদের পাকাশয়ের পীড়ায় মলে টক গন্ধ হয়, সবুজ রং হয় ও ফেনা থাকে। দাঁত উঠিবার সময় শ্লেষ্মাযুক্ত মল হয়। কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় হয় না। অপিয়ম খাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়; লিভারের কার্য্য ভাল করিয়া না হইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। অধিকাংশ স্থলে মাতার দোষে শিশুদের রোগ হয়—মাতার দুগ্ধের দোষে হয়; অন্তের পীড়ায় হয়।

প্রস্রাবের বিষয়।

ইহা দ্বারা শিশুর রোগ নির্ণয় হয় না, কারণ প্রস্রাব পাওয়া যায় না, বিছানা ভিজিয়া যায়। জ্বর হইলে প্রস্রাব অল্প, লালবর্ণ এবং টক্‌গন্ধযুক্ত হয়। ক্রিমি থাকিলে প্রস্রাবের উত্তেজনা হয়। মস্তিষ্কের পীড়ায় প্রস্রাব সাদা হয়। খাদ্য দ্রব্য পরিপাক না হইলে কিম্বা দাঁত উঠিবার সময় প্রস্রাব মলিন হয়।

মুখের চেহারা দ্বারা শিশুর রোগ-নির্ণয়।

১। যদি শিশুর জ্বর হয়, উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে মুখ লালবর্ণ হইবে, কপাল কোকড়ান ও উত্তপ্ত হইবে।

২। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া হইলে চক্ষু চাহিয়া থাকে, বা স্থির ভাবে থাকে এবং গর্ত্তে বসিয়া যায়, অর্দ্ধ-মুদ্রিত থাকে অথবা একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; কপাল সঙ্কুচিত হয়; শরীর শীর্ণ হয়।

৩। শ্বাসযন্ত্রের বা রক্তসঞ্চালনের

পীড়ায়—ঠোঁট কাল হয়, নাসিকার ছিদ্র বড় হয়, মুখের ও চক্ষুর চারি দিকে কাল রেখার দাগ পড়ে; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভাল হয় না।

৪। তলপেটের কোন যন্ত্রের পীড়ায় গণ্ডদেশ ফ্যাকাসে হয়, গাল বসে যায়, মুখ পিছন দিকে বেঁকে যায়, ঠোঁটের রং ফটা হয়, ঠোঁট ভিতর দিকে যায়, বিশেষ নীচেকার ঠোঁট মাড়ির দিকে থাকে।

৫। (Hydrocephalus) মস্তিষ্কের পীড়ায় শিশুর মাথা বড় হয়, মুখ ছোট হয়, কপাল সম্মুখভাগে আসে।

বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

(৫৩০ সংখ্যা—১৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

২৯ শে নবেম্বর, রবিবার ৭টা।

আবার অপরিচিত পথে চলিলাম। বৃষ্টির জলে পথ কর্দ্দমময়। গর্ত্তগুলি জলপূর্ণ। কিছুদূর যাইয়াই এক প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বদিন ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছিল, আজ নীচে অবতরণ শতগুণে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঝরণার মাঝে যে প্রকাণ্ড পাথর রহিয়াছে, লম্ফ দিয়া তাহার উপর পা রাখিতেছি। আলগা পাথর শরীরের ভারে গড়াইয়া যাইবে ভয়ে দুই পাশের জঙ্গল জড়াইয়া ধরিয়া নামিতে চেষ্টা করিলাম। কি ভয়ানক ব্যাপার! ইহা যে বিছুটীর জঙ্গল জানিতাম না। আমাদের দেশীয় বিছুটী ইহার কাছে কোথায় লাগে। দেখিতে দেখিতে দুই হাত ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইল। যে স্থানে বিছুটীর পাতা লাগিয়াছিল, তাহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল। ঝরণা ধরিয়া অনেকদূর যাওয়ার পর এক নদীর ক্ষুদ্র স্রোতে পঁহুছিলাম। এবারও কাপড় ইত্যাদি ভিজিয়া গেল। অনেক দূর এভাবে চলিলাম। জুতা ও বস্ত্রের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব? সহযাত্রী ভদ্রলোক কেবল অদৃষ্টের নিন্দায় ব্যস্ত। বরাবর পিতামাতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১২ টার সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত পীড়িত হইয়া নদীকূলে একটু সমভূমিতে পঁহুছিলাম। আহার ভিন্ন পথ চলা অসাধ্য ভাবিয়া, যে অল্প পরিমাণ মোটা চাউল সম্বল ছিল, তাহা দ্বারা রান্না করা গেল। কোন কোন সহযাত্রী নদীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। কত কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তির সহিত সেই অন্ন আহার করিলাম। নদী পার হইয়া আবার পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। পথে কত প্রকাণ্ড ঝরণা অতিক্রম করিলাম। পর্ব্বতের নিম্নদেশ এলাচের জঙ্গলে পূর্ণ, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই এলাচ গাছ দেখিলাম। সম্মুখে ভুটীয়াদের

কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্টে নিতান্ত আশ্বস্ত হইয়া তথায় পঁহুছিলাম। আশা ছিল, দার্জ্জিলিং কয় মাইল দূরবর্ত্তী, তাহারা তাহা নিশ্চয় বলিয়া দিবে। দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টাতে একটী কথাও বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে সক্ষম হইলাম না। বিষণ্ণ হৃদয়ে আবার গন্তব্য পথে চলিতে হইল। আজ পর্ব্বতের মূলদেশে ৫।৬ টা নদী অতিক্রম করিলাম। দূরে, ধানের ক্ষেত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই ধান ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিলাম। পাকা ধানের সুগন্ধ কি মনোহর! দুই একটী পাহাড়ীর দেখা পাইয়া জানিলাম, পুলবাজার নামক স্থান নিকটবর্ত্তী। অত্যন্ত উৎসাহে চলিলাম। কিন্তু পুল-বাজারের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। আবার ঘোর জঙ্গলে পড়িতে হইল। কখন কখন দুই একজন লোক দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের কথায় নির্ভর করিয়া কেবলই নিরাশ হইতেছি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "পুলবাজার কয় মাইল?" উত্তর "দুই মাইল।" আমরা বলি, না ১০ মাইল হইবে; তাহারাও বলে "হাঁ ১০ মাইল।" প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন এরূপ নিরাশাজনক উত্তর পাইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইতেছি। স্থির করিলাম, পথের দূরত্ব সম্বন্ধে কাহাকেও আর জিজ্ঞাসা করিব না। বাঁশবন ও ঝরণা অতিক্রম করিতে করিতে নিতান্ত দুর্গম স্থানে পঁহুছিলাম। আবার সহযাত্রিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে হইল। এমন বক্রপথে একত্র চলা অসাধ্য। আমার সঙ্গী ডাণ্ডিওয়ালা ও মুটেগণ যমদূতের ন্যায়, তাহাদিগকে লইয়া চলিতে চলিতে মনে কত আশঙ্কা হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এমন স্থানে পঁহুছিলাম, যে স্থানে এক পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পাষাণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। পশ্চাতে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিয়াও দেখা পাইলাম না, অগত্যা ধীরে ধীরে ভগ্ন পথে অবতরণ করিতেছি। নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিব সে আশা হইতেছে না। সৌভাগ্য-ক্রমে নিরাপদে সেই ভয়ঙ্কর স্থান অতি-ক্রম করিলাম। সম্মুখে বিজন বনের অন্ত-রালে ভগ্ন পথ, সহযাত্রীদের কাহারও দেখা নাই, অথচ তাঁহাদের অপেক্ষায় এই অন্ধ-কার মধ্যে ডাণ্ডিওয়ালাদের সহিত বসিয়া থাকাও ভয়ানক। অন্ধকারে পথ দৃষ্ট হয় না, অতি সাবধানে চলিলাম। প্রাণের দায়ে ডাণ্ডিওয়ালাদের ধর্ম্মজ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্য ঈশ্বর, পরকাল, পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করা গেল; কিন্তু তাহাদের মনে যে কোন একটা ভাব জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম, এরূপ বোধ হয় না। ভুটিয়াদের ধর্ম্মজ্ঞান আশ্চর্য্য ধরণের। তাহাদের ভূতের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তাহারা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ভূতের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। আমরা চলিতেছি, পর্ব্বতের যে স্থানে প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে সেই স্থানে ভূতের বাস বলিয়া ডাণ্ডিওয়ালাগণ ভয়ে

মৃতপ্রায় হইয়া প্রাণপণে দৌড়িতেছে। আমিও সেই সুযোগে তাহাদিগকে ঈশ্বরের শক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। হায়! কুসংস্কারের অধীন হইয়া জীবন্ত মনুষ্য যে কত হীনদশাগ্রস্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিলাম। এই ভীমকায় বলিষ্ঠ লোকগুলি ভূতের ভয়ে এত কাতর, যে আমি ভূত তাড়াইবার যে কোন উপায় বলিব, তাহাই করিতে প্রস্তুত। এ দিকে যত হাঁটিতেছি, দুর্গম পথ আর শেষ হয় না। রাত্রিও অধিক হইল, "পুল-বাজার" নিকটে, কেবল এ আশায় নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এক জন সহযাত্রীরও দেখা পাইলাম না। একটা নিবিড় বাঁশবন ভেদ করিয়া চলিতেছি। এমন সময়ে কোন বন্যজন্তুর এমন একটা ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল যে, আমার শরীরের ধমনীগুলি কম্পিত হইয়া উঠিল, এমন একটা বিষম আতঙ্কের অবস্থা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। তথায় দাঁড়াইয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে দ্রুত-গতিতে চলিলাম। নদীস্রোত চলিয়াছে বলিয়া নিম্নভূমির ধান্যক্ষেত্রগুলি ভয়ানক কর্দ্দম পূর্ণ। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া চলিতে যে কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। জুতা কখন কখন কর্দ্দমে বদ্ধ হইয়া খসিয়া থাকে। আজ যে কোন লোকা-লয়ে পঁহুছা ভাগ্যে ঘটিবে, সে আশা মনে একবারও জাগিতেছে না। এমন ঘোর প্রতিকূল অবস্থায়ও যেন এক নূতন বল পাইয়া চলিতেছি। এ দিকে দুরন্ত শীতে হাত পা শরীর অসাড় করিয়া তুলিতেছে। হঠাৎ দূরে আলো দেখিয়া প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল, কতকগুলি শুষ্ক বাঁশপাতার আলো জ্বালাইয়া দ্রুতপদে চলিলাম। "ওগো তাঁহারা আসিতেছেন" আমার সহযাত্রী ভগ্নীর এই স্বর যেন সেই ঘোর শ্রান্তি ও নিরাশার মধ্যে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। যে পুলবাজারের অন্বেষণে এত ঘুরিয়াছি, এখন সেই পুলবাজার পঁহুছিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পিতাকে কত ধন্যবাদ দিলাম। দুইটী সহযাত্রী অগ্রে পঁহুছিয়া আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এত বিলম্ব দেখিয়া বিপদ আশঙ্কায় কতই উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন! আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন, সকলেই বুঝি একত্র আসিয়াছি। আশ্রয়স্থানে পঁহুছিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। যে ৬ জন সহযাত্রী পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের কষ্ট ভাবিতে ভাবিতে মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ঘোর অন্ধকারে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাত্রির মধ্যে পঁহুছিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ হইতে লাগিল। একান্তমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দূরে কথা শুনিয়া আশা হইল, তাঁহারা আসিতে-ছেন। সকলকে নিরাপদে পঁহুছিতে দেখিয়া যে অসীম আনন্দ জন্মিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

দলের অধিনায়িকা আমাদের কষ্ট দেখিয়া নিজকে শত দোষী ভাবিতেন। এবার এত কষ্টের পর একত্রিত হইয়া আমাদের গলা জড়াইয়া আনন্দের আতিশয্য বশতঃ কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতিকূল অবস্থা আমাদের বন্ধুতা যেন শত গুণ দৃঢ় করিয়া দিল। পরস্পরকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া গৃহাদির শৃঙ্খলায় ব্যস্ত হইলাম। "পুলবাজার" প্রকৃত পক্ষেই একটী বাজার। এখান হইতে অনেক আহারীয় দ্রব্য প্রতি সপ্তাহে দার্জ্জিলিং প্রেরিত হয়। মাড়োয়ারী মহাজনগণ বাজারের একমাত্র অধিবাসী। তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন; তাহা কদাচ ভুলিব না। এক মহাজন আমাদের রাত্রিবাসের জন্য নিজের দ্বিতল ঘর ছাড়িয়া দিলেন। পরিষ্কৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া যে আরাম অনুভব করিলাম, কোন কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমাদের কথা বুঝিতে পারে, এমন লোক পাইয়া, কতদূর আশ্বস্ত হইলাম, তাহা কেবল আমরাই অনুভব করিতে পারি।

সেই মহাজন গরম লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া উপহার দিলেন। আহার করিয়া বোধ হইল, এমন উপাদেয় দ্রব্য জন্মেও যেন আস্বাদন করি নাই। শুনিলাম, দার্জ্জিলিং এখান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী, পরদিন ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে পঁহুছিতে পারিব। সকলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের আনন্দে নিদ্রা আসিল না। আজ আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন, পথের কষ্ট ও এক এক জনের আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে যে হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহা বলিবার নহে। গৃহে ৩টী শিশুর সরল স্নেহপূর্ণ মুখ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এত ব্যগ্রতা বোধ হইতেছে যে, এ ঘোর রাত্রিতেও যাত্রা করিতে প্রস্তুত। এক সপ্তাহের অধিক কাল পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমার সংবাদও কেহ জানেন না, আমিও কোন সংবাদ রাখি না। নানা চিন্তার তরঙ্গ হৃদয়ে খেলিতে লাগিল। হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চমকিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম।　　(ক্রমশঃ)

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বনচারিবাগান হইতে যখন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। গ্রামের মধ্য দিয়া গমন না করিয়া তাঁহারা গঙ্গার কিনারা দিয়া চলিতে লাগিলেন। দুর্ব্বিষহ চিন্তায় তাঁহাদের গতি অতীব শিথিল হইল; চরণ যেন অগ্রসর হইতে রাজি নহে। অমলা অগ্রে

অগ্রে চলিতেছেন, আর অমিয় ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন; কাহারেও মুখে বাক্য নাই; পদক্ষেপে শব্দ নাই; কোনও দিকে দৃষ্টি নাই; আছে কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আর জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ।

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এইরূপে পথ অতিক্রম করিবার পর অমলা অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। অমিয়ও এরূপ নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন যে, অমলা যে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন তাহা তিনি দেখেন নাই; সুতরাং অমিয় আসিয়া অমলার গাত্রের উপর পড়িলেন। ঝোঁক সামলাইতে না পারায় অমলা পড়িয়া গেলেন; অমিয়ও অমলার উপর পতিত হইলেন, অমলাকে অধিক আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া অমিয় শশব্যস্তে উঠিয়া "বৌদিদি! তোমায় বড় লেগেছে," বলিয়া অমলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে, অমলা হস্ত দ্বারা অমিয়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অমিয় ইহার কারণ কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নিশ্চই সম্মুখে কোনও বিপদ উপস্থিত, সেই জন্য অমলা তাঁহাকে বাক্যোচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অমলা অমিয়ের হাত ধরিয়া বসাইলেন। দুইজনে নদীকূলে সৈকতের উপর উপবিষ্ট হইলে, অমলা সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অমিয় দেখিলেন অদূরে এক স্থূলকায় ব্যক্তি উপবিষ্ট। এক্ষণে তাঁহাদের চৈতন্যের উদয় হইল। তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহারা নবদ্বীপ হইতে বহুদূর আগমন করিয়াছেন; চারিদিকে শ্মশান; মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই; কোথাও বা শূন্য কলসী গড়াগড়ী যাইতেছে; কোথাও বা অর্দ্ধদগ্ধ বংশ খণ্ড; কোথাও বা ছিন্ন কন্থা; আর কোথাও বা নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়া যেন পথিককে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে,—'রে অজ্ঞান! একবার আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, আমিও একদিন তোর মত ছিলাম!'

যাহা দেখিলেন তাহাতে অমিয়ের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"বৌদিদি! এখন উপায় কি?"

"উপায় আর কি! ভগবান্‌কে ডাক্।"

"যদি ও আমাদি'কে ধরতে আসে, কি করিবে?"

"আমার বোধ হয় ও আমাদিগকে অন্ধকারে দেখতে পায়নি; এই সময় বসে বসেই আস্তে আস্তে নবদ্বীপের পানে ফিরে যাই চল্।"

"ওতো বড় বেশী দূরে নাই। যদি দেখ্‌তে পেয়ে থাকে, আর আমরা ফিরিবার সময় এসে পথ আটক করে?"

"তাও বটে; ও তোর কথাটাও বোধ হয় শুনিতে পেয়ে থাক্‌বে। তবে এক কাজ করা যাক আয়; এই তো পাঁচ ছয় হাত দূরেই নদী; নদীর ঠিক জলের

ধারটীতে বসে থাকা যাক। এখানে নদীতে বেশী জল; ও এতটা দৌড়ে আমাদের কাছে আসতে না আসতে আমরা বিপদের সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারব। এ আত্মহত্যায় পাপ নাই; স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা হলে আত্মহত্যাও ভাল; তাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন।"

বেশ কথা বৌদিদি! আমরা এক গলা জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিগে; তা হলে আমাদের কোন ভয়ই থাকবে না।"

"তবে আস্তে আয়" এই বলিয়া অমলা সেই স্থূলকায় পুরুষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে পিছু হাঁটিতে লাগিলেন; অমিয়ও সেই ভাবে তাঁহার সহিত চলিতে লাগিলেন।

নদীর জল স্পর্শ করিবামাত্র দেখিলেন যে, সেই পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া অমিয় ও অমলা দ্রুতগতি দুই তিন হাত জলে নামিয়া পড়িলেন। অমিয় ও অমলা এখনি প্রাণত্যাগ করিতে পারে দেখিয়া সেই স্থূলকায় পুরুষ দূর হইতেই "অমলা দাঁড়া, আর বেশী জলে নামিস না" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিলেন।

বিস্ময় ও ভীতি উভয়ের হৃদয়কে যুগপৎ আলোড়িত করিতে লাগিল। অপরিচিত ব্যক্তি অমলাকে নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করায় তাঁহাদের ভীতির মধ্যেও কিঞ্চিৎ সাহসের উদ্রেক হইল। তাঁহারা আর অধিক জলে গমন না করিয়া একদৃষ্টে সেই পুরুষের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সেই স্থূলকায় পুরুষ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে সাবধান হইয়াও থাকিতে হইবে। তাঁহারা দেখিলেন যে সেই পুরুষ কোন দস্যু নয়, তিনি একজন সাধু পুরুষ, বয়স ৭০।৮০ বৎসর; তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমিয় ও অমলা একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহারা ভীত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সাধু কহিলেন, "তোদের কোন ভয় নাই, জল হতে উঠে আয়।"

অমলা কহিলেন, "প্রভু! আপনি কে?"

"তোদের ছেলে।"

"আপনি এখানে কেন?"

"তোদেরি জন্য।"

"আমাদের জন্য কিরূপ? আপনি কি আমাদিগকে চিনেন?"

"হাঁ কতকটা চিনিতে পারি।"

"আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলেন?

"না।"

"তবে আমাদিগকে জানেন কিরূপে?" আমার নাম জানলেন কেমন করে?"

"আমরা যোগবলে সব জানতে পারি।

সে কথা যাক, এখন তোরা যাবি কোথা বল্ দেখি?"

"ভগবান্ যেখানে নিয়ে যান।"

"কালীঘাট যাবি নয়?" এই কথা বলিয়া সাধুপুরুষ প্রত্যাগমনের উপক্রম করিলে, অমিয় ও অমলা নদী হইতে আসিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা জল হইতে তীরে উঠিলেন, তখন সাধু তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় ৬।৭ হস্ত দূরে গমন করিয়াছেন। উভয়ে জল হইতে উঠিয়া "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধুর কৃপা হইল। তিনি কহিলেন, "যা, তোরা এখন সধবা।"

সাধুর বাক্যে তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মস্তক অবনত করিলেন। মস্তক অবনত করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী অদৃশ্য; চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, অনেক কাতরোক্তি করিলেন, কিন্তু সাধুর আর দর্শন পাইলেন না। তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উভয়ে তথায় উপবেশন করিলেন। অমলার মানসিক অবস্থার কোনও বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইল না। অমিয় যেন আর অমিয় রহিলেন না; তিনি বালুকার উপর শয়ন করিয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকল্যাণীচরণ হাজরা।

সতী-যাত্রা। *

১

অকালে নলিনী বালা! গেলে মা কোথায়?
শোকাতুরা জননীরে,
ক'টি ভ্রাতা ভগিনীরে
পতি আত্ম পরিজনে কাঁদায়ে সবায়!

২

কুক্ষণে ইন্দুর পত্র দিল এ সংবাদ।
নলিনী তুমি মা নাই!
চমকি উঠিনু তাই,—
বিনা মেঘে শুনি যেন ভীম বজ্রনাদ।

৩

তব মাতা বিষাদিনী পাগলিনী পারা,—
তোমা শোকে চারিধার,
হেরিছেন অন্ধকার,
বহিছে নয়নে আহা! অশ্রু শত ধারা!

৪

ফিরে এসে দেখ বাছা! দশা তব মা'র—
অনাহারে অনিদ্রায়,
সাড়হীন মৃতপ্রায়,
রোগাক্রান্ত শীর্ণ দেহে শ্বাস মাত্র সার।

* এই কবিতাটী মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী বালার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত।

৫

শুনি তব রোগবার্ত্তা ব্যাকুল হৃদয়ে,
আনালেন মা তোমারে,
রোগমুক্ত করিবারে,
দূরদেশ আগ্রা হতে পাঠায়ে তনয়ে।

৬

এলে পতি ভ্রাতা সহ প্রভাতে হেথায়,
স্নেহময়ী তব মাতা,
পতি আর ভগ্নী ভ্রাতা,
হলেন নিযুক্ত সবে তব শুশ্রূষায়।

৭

হইল চিকিৎসা কত বাঁচাতে তোমায়,
ব্যর্থ করি সে সকলি,
দিয়ে মায়া জলাঞ্জলি,
চির তরে গেলে চলি মধ্যাহ্ন বেলায়।

৮

শাঁখা নোয়া, ফুলমালা সিন্দূর পরিয়া,
অলক্ত রঞ্জিয়া পায়,
রক্ত বাসে ঢাকি কায়,
সধবার বেশে কোথা গেলে মা চলিয়া?

(৯)

নিভিল উজ্জল দীপ গৃহ আঁধারিয়া,
উঠিল ক্রন্দন রোল,
মর্ম্মভেদী হরিবোল,
ঘুসিল সতীর যাত্রা চৌদিক্ ধ্বনিয়া।

(১০)

হয়নি দিদির হায় গত বেশী দিন!
আনন্দমোহন স্বামী
হারায়ে দিবস যামী,
শোকদগ্ধা স্বর্ণপ্রভা বিষাদে মলিন।

(১১)

হৃদে তাঁর প্রজ্জলিত পতি-শোকানল।
পাঁচ পুত্র, চারি মেয়ে,
তোমাদের মুখ চেয়ে,
করিতেন সম্বরণ অশ্রু অবিরল।

(১২)

কোথা গেলে তাঁরে তুমি কাঁদায়েনলিনী?
ফুটি তার হৃদি-সরে,
ছিলে যে সৌন্দর্য্য-ভরে,
বিদ্যা গুণে যশো-বাসে ফুল্ল সরোজিনী।

(১৩)

গেলে কি করিতে সেবা তব সে পিতার?
ব্রহ্মে তিনি হয়ে লীন,
যেই স্থানে সমাসীন,
তথা কি গেলে মা! তুমি কাছেতে তাঁহার?

(১৪)

পিতার আদর্শে তুমি গঠিত বলিয়া,
তাই পিতৃপদমূলে,
নবীন জীবন-ফুলে,
পূজিতে নলিনীবালা! গেলে কি চলিয়া?

মর্ম্মাহত,—
শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার, রাজবাটী।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সে তর্ক করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কার্য্যতঃ যাহাই হউক বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই মত যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। এ কথাটী বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। যাঁহাদের ঘরে কচি বিধবা মেয়ে আছে, তাঁহারা অনেকেই তাহাদের বিবাহ দিতে পারিলে যে খুব সুখী হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বিধবা-বিবাহের উচিতমত প্রচলন হইতেছে না কেন? মাঝে মাঝে দুই এক জন লোক দেখা যায়, যাঁহারা সাহস করিয়া আপনাদের বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে এরূপ সৎসাহসী লোক বড় বিরল। কেহ কেহ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে এ কাজে অগ্রসর হইতে চাহেন না বটে, কিন্তু মোটের উপর ধরিতে গেলে সমাজ শাসন বড় কঠোর। অনেকেরই সমাজকে উপেক্ষা করিবার সাহস কুলায় না।

বিধবা-বিবাহ হিন্দু সমাজে যে একেবারে অপ্রচলিত, তাহা বলা যায় না। বেহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর ভিতর ইহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালায় কিন্তু কোন শ্রেণীর ভিতর ইহা দেখা যায় না। এখানে কিন্তু কোন কোন জাতি বা শাখার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক সময় বেশী পণ না দিলে বিবাহ করিবার জন্য কন্যা মিলে না। মনে হয় ইহাদের ভিতর যদি বিধবা-বিবাহ চলিত থাকিত, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইত।

বাঙ্গালার সমাজশাসন কি বেহার ও উড়িষ্যা অপেক্ষাও দৃঢ়তর? বাঙ্গালী হিন্দুরা কি তাঁহাদের বেহারী ও উড়িয়া ভ্রাতৃগণ অপেক্ষাও সমাজভয়ে বেশী ভীত? বাঙ্গালীরা কি, অন্ততঃ কোন বিষয়ে, বেহার ও উড়িষ্যাবাসী অপেক্ষাও ভীরু? না বাঙ্গলার সমাজ-জীবন বেশী উন্নত ও অগ্রসর এবং সেই জন্য সমাজ-বন্ধন দৃঢ়তর? এ সব বড় জটিল প্রশ্ন। সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহাদের আলোচনা করিবেন। আমার পক্ষে ইহাদের আলোচনা ক্ষমতার অতীত। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে, যতদূর জানি, বেহার ও উড়িষ্যায় যেরূপ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, বাঙ্গালায় সেরূপ শ্রেণীর মধ্যে ইহা অপ্রচলিত। ইহাদের মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিলে যে অন্য শ্রেণীর মধ্যে ক্রমে চলিত হইত তাহা নয়, কিন্তু ঐ সব শ্রেণীর কতকগুলি বিধবার কিনারা হইত।

গত আদম সুমারীর বিবরণী আমার কাছে নাই। তবে শুনিতে পাই সমগ্র ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের

সংখ্যা বেশী এবং বাঙ্গলা দেশেও তাই। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। একটা কারণ এই যে, অন্যান্য দেশ হইতে নানা কার্য্যোপলক্ষে ভারতে অনেক পুরুষ আসে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পরিজনবর্গকে সঙ্গে না আনিয়া আপন আপন দেশে রাখিয়া আসে। আমাদের দেশেও উড়িষ্যা, বেহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অনেক পুরুষকে কাজ কর্ম্মের জন্য আসিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অনেকই স্ত্রী সঙ্গে আনে না। সামান্য শ্রমজীবীর কাজের জন্য কিন্তু বাঙ্গলা হইতে অন্য প্রদেশে খুব কম লোকেই গিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা হইতে যাঁহারা বিদেশে যান, তাঁহাদের অধিকাংশই উচ্চতর কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে দেশ ছাড়েন, এবং অনেকেই পরিবার সঙ্গে লইয়া যান। অন্যান্য দেশ হইতে এ দেশে অনেক পুরুষ-সমাগম, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের আধিক্যের ইহা একটা কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা যে এক বিশিষ্ট কারণ, আদম সুমারীর বিবরণীর অভাবে তাহা বলিতে পারি না। (১)

হিন্দুর মধ্যে যখন জাতিবিভাগ আছে, তখন দেশে মোট পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের সংখ্যা ধরিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধে কোন মত দিলে তাহা ভ্রমাত্মক হইবে। জাতিবিভাগ অগ্রাহ্য করিবার সময় আজও আসে নাই। আর একটী কথা মনে রাখা দরকার। ইউরোপাদি অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা বিঘ্ন নাই, এবং উহার বহুল প্রচারও আছে। কিন্তু ঐ সব দেশে অনেক মহিলা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করেন। তাহার ফল এই হয় যে, বিবাহার্থিনী বিধবারা একটু সুবিধা পান। আমাদের সমাজে কিন্তু বিবাহ বিষয়ে কুমারীর প্রতিযোগিতা ইউরোপাদি দেশের অপেক্ষা কিছু বেশী। ব্রাহ্মণদের কোন কোন শাখার ভিতর উপযুক্ত বরের অভাবে কখন কখন কন্যাকে চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিতে হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ধরিতে গেলে সকল কুমারীরই বিবাহ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং হইয়াও থাকে। কাজে কাজেই বিধবার পাণিগ্রহণপ্রার্থী পুরুষের সংখ্যা বেশী না হইবারই সম্ভাবনা। তাহার উপর ত আবার সমাজ-শাসন আছেই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিধবার বিবাহ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন ব্রাহ্মণদের কোন কোন শাখার মধ্যে বরের অভাবে কন্যার বিবাহ কঠিন, সেইরূপ এমন কতকগুলি শাখা আছে

(১) সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে যে বা লোকসংখ্যা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দু জাতির সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে; ইহা অবশ্যই সুলক্ষণ নহে। ইহার একটী প্রধান কারণ —হিন্দু জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের অপ্রচলন। অপুত্রা বালবিধবাদের বিবাহপ্রথা বহুলরূপে প্রচলিত হইলে এ অনিষ্টের নিরাকরণ হয়—স।

যাহাতে কন্যার অভাবে কতক পুরুষকে অধিক বয়সে বিবাহ করিতে বা যাবজ্জীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া সমাজে অনেক জাতি আছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্য পুরুষের অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা কম বলিয়া মনে হয়।

সমাজ বর্দ্ধনশীল হওয়া আবশ্যক। যে সমাজ বর্দ্ধনশীল নয়, আজ হউক কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক তাহাকে পৃথিবী হইতে লোপ পাইতেই হইবে। সমাজের কল্যাণার্থে ইহা আবশ্যক যে তাহা যতদূর সম্ভব বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ নরনারীর সংখ্যায় পূর্ণ হয়। যে পরিমাণে সমাজ ঐরূপ নরনারীর ভার বহন করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে উহা উন্নত ও বর্দ্ধনশীল। অতএব যে সমাজের অন্তর্গত সকল বা অধিকাংশ নরনারীর বিবাহ হইবে এবং সকল বা অধিকাংশ দম্পতী যতগুলি সম্ভব বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ সন্তান উৎপাদন করিবে, সেই সমাজের স্থায়িত্ব ও কুশল এক রূপ অনিবার্য্য হইবে। এই দিক্ হইতে দেখিলে সমগ্র হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ কতকটা নৈরাশ্যপূর্ণ। প্রত্যেক আদম সুমারীতে দেখা যায় যে, যে পরিমাণে হিন্দুর সংখ্যা বাড়া উচিত, তাহা হইতেছে না। মুসলমান সমাজ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুসমাজ তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুর পক্ষে ইহা বড় ভাবনার কথা; কারণ, হিন্দুসমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক—কোন, হিন্দুসন্তান ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ অনেকটা প্রচলিত আছে এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিবাহও বিরল নয়। মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধির ইহা এক অন্যতম কারণ।

যদি হিন্দুসমাজকে বিলোপ হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে কয়েকটী কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে—(১) সমাজের লোকদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান; (২) সমাজের অন্তর্গত সকলের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা; (৩) সমাজে যতদূর সম্ভব বলশালী ও কর্ম্মকুশল নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন। প্রথম দুইটীর সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর কিছু বলিতে চাহি না। তৃতীয়টী সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলিতে চাই। এই উদ্দেশ্যটী সংসাধন করিতে হইলে সমাজকে দেখিতে হইবে যে, ইহাতে বহুসংখ্যক বলশালী ও কার্য্যকুশল নরনারী জন্মায় ও স্থান পায়। এরূপ জনসমষ্টি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজের কি করা আবশ্যক? তাহাকে দেখিতে হইবে যে, সন্তানোৎপাদনক্ষম সবল ও অধিকসংখ্যক পুরুষ ও গর্ভধারণদক্ষ সবল ও অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্ভবপর হয়। বলা বাহুল্য, আমি যে সন্তানের কথা বলিতেছি, তাহা সুস্থ ও সবল, ম্যালেরিয়াভোগা পিলে রোগা সন্তান নয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার আবশ্যক হইবে, কারণ উহা সমাজের বলনাশক। উহাতে

সাধারণতঃ পিতা মাতার শরীর শীঘ্র ভগ্ন হয়, এবং সবল সন্তানোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। যেমন একদিকে বাল্যবিবাহ সমাজের মহা অপকারী, সেইরূপ স্ত্রী পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহও উহার বিষম ক্ষতিকারক। কারণ, ইহাতে সমাজের সন্তানসমষ্টি কম হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহা একরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমাজ যদি আপনাকে রক্ষা করিতে চায়, আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে ইহার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে, ইহার অন্তর্ভূত সবল সন্তানোৎপাদনসক্ষম পুরুষের ও গর্ভধারণক্ষমা স্ত্রীলোকের যতদূর সম্ভব উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয়। যে পরিমাণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, সেই পরিমাণে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। হিন্দুসমাজে দেখিতে পাই যে, কতকগুলি সন্তানোৎপাদনক্ষম পুরুষের হয় মোটে বিবাহ হয় না, অথবা অধিক বয়সে বিবাহ হয়, এবং অনেকগুলি গর্ভধারণক্ষমা বিধবাকে গর্ভধারণকার্য্যে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়। ইহা সমাজের কত দূর অনিষ্টের কারণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমার মনে হয় বিধবাবিবাহের আলোচনায় আমাদের গুটিকতক কথা স্মরণ রাখা দরকার—(১) হিন্দুসমাজ জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত; (২) ইহাতে সাধারণতঃ কোন স্ত্রীলোক চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন না; (৩) ইহাতে কোন কোন শাখা ও জাতি কন্যাবহুল, এবং কোন কোন শাখা ও জাতি পুত্রবহুল। জাতিভেদ থাকার জন্য এক শাখা বা জাতির কন্যাবহুলত্ব দোষ অন্য শাখা বা জাতির পুত্রবাহুল্য দোষ দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। কাজে কাজেই স্বভাবতঃ মনে হয় যে, সামাজিক হিতের জন্য যে সব শাখা ও জাতির মধ্যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক, তাহাদের ভিতর বিধবাবিবাহ অগ্রে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার মতে অন্য শাখা ও জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই। বিধবাবিবাহের প্রতি বিরাগ ও আপত্তি সমাজের সকল বিভাগ হইতে দূর হওয়া উচিত। এখানে আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, সমাজের মঙ্গলার্থে ইহার যে সকল বিভাগে বিবাহযোগ্যা কন্যার অপেক্ষাকৃত অভাব, সেই সকল বিভাগে বিধবাবিবাহ অগ্রে প্রচলিত হইলে বড় ভাল হয়। মনে হয় যে, সমাজের নেতৃবর্গ (যদি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এরূপ কেহ থাকেন) মনোযোগপূর্ব্বক এই কথা যদি একটু ভাবেন, এবং এ সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। কুমারী কন্যার যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দিতে না পারিলে তাহার পিতৃপুরুষ নিরয়গামী হইবেন এ বিশ্বাস লোকের মনোমধ্যে যত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে, কিম্বা মন

হইতে অপসারিত হইলেও সমাজের ভয়ে লোককে এই বিশ্বাসের বাহিক ভান করিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কন্যা-বহুল শাখা বা জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে বিধবাবিবাহ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সব শাখা বা জাতির ভিতর কন্যা কিছু বিরল, ভাল করিয়া চেষ্টা করিলে এবং ঐ চেষ্টা কিছুকালব্যাপী হইলে উহাদের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মন হইতে বিধবাবিবাহের প্রতি বিরাগভাব ক্রমে ক্রমে অপনীত হইতে পারে। স্বজাতি-রক্ষা ও আত্মসুখ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এই ব্যাপারে সাহায্য করিবে বলিয়া অনুমান হয়। উক্ত লোকদের মন যদি বিধবা-বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ক্রমে অন্যান্য শাখা বা জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকদের মনের উপর যে তাহার কোন ফল হইবে না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মনে যে কয়টা কথা উদয় হইয়াছে, বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাহা ব্যক্ত করিলাম। উহাদের ঔচিত্য অনৌচিত্যের ও কার্য্য-কারিতার বিচারভার তাঁহাদের উপর। এ প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সামাজিক দিকেরই কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করা হইয়াছে, উহার ব্যক্তিগত দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম, এ,

নূতন সংবাদ।

১। বামাবোধিনী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করাতে আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, স্বর্গগত সম্পাদক মহাশয়, তাঁহার স্বর্গারোহণের ৩।৪ মাস পূর্ব্বে, বঙ্গমহিলাদি গকে যে ভাবে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিতা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ যতদূর সম্ভব কতকগুলি রন্ধন, পাঠ, শুশ্রূষা, ব্যায়াম, পূজা ইত্যাদি চিত্রে সম্বলিত করিয়া একখানি চিত্র অঙ্কিত করান এবং উহা বামাবোধিনীর প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার শুভ জন্মমাস ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইবে এরূপ স্থির করেন। তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছানুসারে ভাদ্রমাস হইতে সেই চিত্র সন্নিবেশিত হইতেছে।

২। কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে গত ৪ ঠা নবেম্বর কাশীম-বাজার রাজভবনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনীতে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে অনেক সাহিত্যসেবী একত্র সম্মি-লিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করেন। এই সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন রাজসাহিতে হইবে স্থিরীকৃত হয়। অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন ও ইহার সকল কার্য্যের সু-বন্দোবস্তের জন্য মহারাজ বাহাদুর ধন্য-

বাদার্হ, তাঁহার অমায়িক আদর, যত্ন ও অভ্যর্থনায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছেন।

৩। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটী কন্যা প্রসব করিয়া গত বুধবার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিদান করুন।

৪। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মোৎসব উপলক্ষে লালা লজপৎরায় ও অজিত সিংহের নির্ব্বাসন-দণ্ড রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত উমেশানন্দ দত্ত ওঝা বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার পদ পাইয়া সদনুষ্ঠানে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তত্রত্য রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ আশ্রমের জন্য ভূতপূর্ব্ব প্রধান পাণ্ডার দেয় চাঁদার টাকা বহুকালাবধি উক্ত আশ্রমে দেওয়া হয় নাই। তিনি এক্ষণে সে সমস্ত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সূত্রধর তত্ত্ব—শ্রীবিহারি লাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধর জাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। উঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্। উঁহাদিগকে অপকৃষ্ট বর্ণমধ্যে গণ্য করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

২। প্রফুল্ল নির্ম্মাল্য—শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। ইহার ভূমিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রফুল্ল একটী স্বর্গীয় পারিজাত, মর্ত্ত্যে আসিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমায় ও সৌরভে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। এই স্বল্পদিনে সকলের হৃদয়ে যে একটু দিব্য জ্যোতিঃ রাখিয়া গেল, তাহার ধ্বংস নাই।" এ গ্রন্থ গ্রন্থকারের প্রাণময়ী ভাষা। ইহা সমালোচনার অতীত।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রতি।

এলিরে এলিরে তুই ফিরে ঘরে আজ।
দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ,
আমার কথাটি রাখ,
তোর এ দুখিনী বোন বুকে সহে বাজ।

আঁখি মেলে চাহ ধীরে ভগিনীসমাজ।
ফোটা ফুল ঝরে গেছে,
জোৎস্নাটুকু নিভায়েছে,
অসৌরভ অন্ধকার উদাসীর সাজ।

আছে সে আনত মুখে পেয়ে ভয় লাজ।
পুড়ে গেছে হৃদি মর্ম্ম,
জানে নাক কর্ম্মাকর্ম্ম,
মোহান্ধ অজ্ঞান তলে ভুলি নিজ কাজ।

তাই কি ব্যথিত হয়ে উদিলিরি আজ?
মুছাতে শোকাশ্রু-নীর
হইয়ে অতি অধীর,
পূরব গগনে যেন নব রবি সাজ।

এলিরে আবার ফিরে ঘরে তুই আজ।
ভাঙ্গা প্রাণ জোড়া দিতে,
হৃত শক্তি সঞ্চারিতে,
নির্ধনেরে ধন দিতে দীন ঘরে আজ।

জাগারে মুমূর্ষু প্রাণে জীবন্ত প্রভাব।
জড়তা হউক দূর,
প্রাণে কর ভরপুর,
সঞ্জীবনী সুধারস স্বর্গীয় স্বভাব।

সারাবর্ষ কেঁদে কেটে হয়েছে নিরাশ।
ধন রত্ন ছিল যাহা
হরেছে তস্কর তাহা;
দরিদ্র ভিখারী সম বুকে দীর্ঘশ্বাস।
তাই কি দেখিতে তুই এলি তার পাশ।

এঘোর পরীক্ষানলে দহে দিবা রাত।
ভুলে আছ দেবসেবা,
কর্ত্তব্য বা আছে কিবা,
তোর ও পূজার তরে কাঁপে দুই হাত।
যেন কত অপরাধি সহি প্রতিঘাত।

তার তরে তুমি আজি খুলিয়া ভাণ্ডার।
ডাকিতেছ বাহু তুলে,
কতনা স্নেহের বোলে,
বিলাতে অপ্রাপ্য ধন মরত আগার।

শুভ মুহুর্ত্তের মাঝে দামিনী ঝলকে।
প্রকাশি পবিত্র চিত্র,
বাঁধিলে একতা সূত্রে,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে মধুর আলোকে।

বিধাতার দুই বাহু পুত্র কন্যা সম।
সাধিতে অবনী কাজ,
শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ,
অবতীর্ণ ধর্ম্ম কর্ম্ম চিত্র অনুপম।

এক তরু দুটি ফুল সৌরভে সমান।
দুর্গন্ধ করিবে দূর,
মকরন্দ সুপ্রচুর
ঢালিবে অজস্রধারে জগত বিতান।
অটল অচল হয়ে পালিবে বিধান।
সুখে শান্তি দুঃখে দৈন্য
পাপ তাপ ধর্ম্ম পুণ্য
পথভ্রষ্ট নহে কদা ধীর মতিমান্।

উড়ায়ে সুকীর্ত্তি ধ্বজা ইঙ্গিতে আবার।
প্রকাশি মহিমা তব,
শিখাতেছে নব নব,
অশেষ সরল মনে কত সদাচার।

এসেছ দুখীর ঘরে দয়ার আধার
ঘোর ঘোর এ আঁধারে
উজলিয়া চারি ধারে,
পবিত্র প্রভাবে ব্যথা ভুলি একবার।
তুলিয়ে কোমল কর মোছ অশ্রুধার।
নমামি ও পুণ্যপদে ভাইদ্বিতীয়ার।
স্বদেশ স্বজন মাঝে হও হে প্রচার। শ্রীনিঃ

Bamabodhini Patrika.

In the issue of June last we published one of a series of letters written by the late Mr. A. M. Bose to his wife to show that he was a model husband. Below is given another of the series. We intend to publish in future some more of his letters to his wife, friends and relatives—which, we hope, will give an insight into his noble character and public spirit.

WILSLIGDEN.
22nd June, 1894.

MY DEAR WIFE,

Yours of the 29th May reaches me this week. I am glad to learn you had by this time being relieved by all anxiety on my account by hearing news of my safe arrival in London. God comfort you and bless you under all circumstances. Never be anxious on my account. I am, I venture to believe, under His loving protection.

He, in his boundless mercy, take me back, I pray, strengthened in body and mind.

Do you know you will have a great deal—a very great deal of work to do when I come back, and you had better prepare yourself well for it from now. Time unfortunately does not permit of all that I think about the future. That future as yet seems somewhat perplexed. I feel *how happy* I should feel if I could devote my future entirely to work for my country, my God and my beloved ones. But for some years yet to come, circumstances will perhaps compel me to work for my profession also, inorder that I my be able to leave my dear ones without any burden, and after that time if God spares my life till then, I could be free to devote myself entirely to His service. But what in the mean time? I want you with my help and direction to be my true helpmate and do the work so far as our heavenly father gives you the strength, which I should otherwise have done or at least a part of it. Wouldn't that be doing the work, my darling, of a true wife and of a true child of God too? I know you will be inclined to say that while you will be glad to do so, you have not the power or the fitness for the work. But no one can say what his powers are until he throw himself into the work and remember, I will be with you and you can at least help me in all in which I want your help and the good God does so much for us.

You know my dear, I never flattered you and therefore you will believe when I say that you can write *very* good Bengalee; cultivate and practise this power regularly and diligently. Read good books with care to increase this power, read useful English books to get good materials and thoughts and beyond and above all, pray to God to consecrate all your powers into His service. Let me enumerate some of the things I want you to do in this connection during the period of my absence. (1) I want you to practice writing, say in the সখা or বামাবোধিনী or তত্ত্বকৌমুদী

or otherwise and to read a large number of good books, English and Bengalee. (2) I want you to practise writing poetry. You will perhaps at once profess your inability. But don't mind that. Try. There is no harm in trying. I shall require you when I come back to compose songs for our services &c. Who knows if the spirit of God may not lead you to sing them too in public meetings some day. Songs are of great importance. They often preach better than sermons, and find their way into the heart. Writing to you from Germany I may tell you that national songs and hymns have done more to unite this country and place it in the proud position it occupies today than its armies. In fact its armies have been the result of the spirit which these songs aroused in the whole community. (3) I want you to write novels or little stories. Do you remember that long ago I told you to write or to try to write a novel. Those little stories that Rabindranath writes in the বালক, ভারতী &c. I have often found very touching. In order to help me in my work, you will have to write little stories. So qualify yourself for it from now. What a *revolution* that one book Uncle Tom's Cabin produced in America! It stirred up people's hearts to their deepest depths and awakened the conscience of the manhood of America to deadly struggle against the gigantic slave-power. True, all have not the genius of Mrs. Stowe. But each one can put forth what little is consecrated in the service of God. Do you know how much He increases it, and blesses it to fruitfulness? Look at the daughters of General Booth, eldest the Marechale (Mrs. Booth Clebborn) in France, the 2nd (Mrs. Booth-Tucker) who was in India but now working in England in charge of the Foreign Work Department of the Salvation Army, the 3rd Miss Eva Booth also working in England in charge of Women's Training Home, and the 4th Miss Lucy Booth, Col. Ruhani of India whom you know, and these are all the daughters of General Booth. No one can say that they were geniuses nor have they received anything but the most ordinary education. If they had not devoted themselves to the service of God, they would have been simply average middle class English girls or women such as there are in thousands of English families, and of whom nobody have taken any note. But now notice what wonderful powers they are displaying, and what sources of unspeakable blessing they are proving to thousands of suffering men and women in various lands. Yes, it is *wonderful* what interest—double and treble and hundredfold interest—God returns to any little human capital which may be invested in His service.

Yours

A. M. Bose.

২৯।১ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীশ্রকুমার দত্ত কর্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 532. December, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩২ সংখ্যা। { অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। ডিসেম্বর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মৃতা স্ত্রীর ভগ্নীর সহিত বিবাহ—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টার পর ইংলণ্ডের মহাসভা মৃতা স্ত্রীর ভগ্নীর সহিত বিবাহ বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান পাদরী স্বীয় অধীনস্থ ধর্ম্ম-যাজকদিগকে ঐরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা বিবাহ করিতে চান, তাঁহারা সিবিল বিবাহ করিতে পারিবেন। ধর্ম্ম যাজকগণ এখন বলিতেছেন যে, যাঁহারা ঐরূপ বিবাহ করিবেন, তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তাঁহারা যোগ দিবেন না।

ইংলণ্ডে রাজসমাগম—ইংলণ্ডে জর্ম্মণি, স্পেন এবং নরওয়ের ভাবী রাজা ও রাজ্ঞী এবং পর্টুগালের রাজ্ঞী একত্র হইয়াছেন।

শোকসংবাদ—প্রসিদ্ধ হোমিওপেথিক ডাক্তার সালজার বিগত ২৫ শে নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হোমিওপেথিক চিকিৎসায় ইঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। ইঁহার চিকিৎসায় বহুসংখ্যক হতাশ রোগী দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইনি অতি অমায়িক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। মঙ্গলময় ইঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন।

রেলওয়ে বন্ধপ্রায়—কয়েক সপ্তাহ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এঞ্জিন-চালক ও গার্ডগণ সমবেত হইয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সহিত তাহাদের বেতনাদি লইয়া বিবাদ করিতেছে, কিন্তু উভয় পক্ষের কেহই সৎপরামর্শ মানিতেছেন না। ড্রাইভারদিগের নেতাকে কর্ম্মচ্যুত করায় আরও বিবাদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে শুনা যায়, বিবাদ ক্রমশঃ মিটিয়া যাইতেছে।

মহিলার নূতন অধিকার—ইংলণ্ডে

মিউনিসিপালিটীসমূহের নূতন সভ্য নির্ব্বাচনে এবার চারি জন মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীতে স্ত্রীলোকদিগের সভ্যপদলাভ এই সর্ব্বপ্রথম।

বিধবাবিবাহ — মান্দ্রাজে রাজমাহেন্দ্রীর বিধবাশ্রমবাসিনী বালবিধবা শ্রীমতী কাভেরাম্মার সহিত শ্রীযুক্ত নরসিং চারিয়ার বিবাহ হিন্দুপদ্ধতিমতে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ২০ বৎসর, পাত্রের বয়স ৩৫ বৎসর। মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত বীরশালীঙ্গম পান্টাহুর "আনন্দাশ্রমে" এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

নারীদেশ—আমেরিকার ওহিও প্রদেশের সমস্ত রাজকার্য্য নারীদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সেখানে নারী বিচারক, নারী উকিল, নারী দোকানদার, নারী পাদ্‌রী, নারী রেল-পরিচালক। সামরিক বিভাগে দুই একজন পুরুষ ব্যতীত সেথানকার সমস্ত কার্য্যই রমণীগণ করিয়া থাকেন।

পুণ্য-প্রভাত।

প্রভো! তব কৃপাধারামাঝে করি প্রাতঃ-
স্নান,
বিচূর্ণ পরাণে পেনু নবীন চেতন;
মরতের শোকজ্বালা, বৃথা যে ধূলির খেলা,
ভাঙ্গিয়াছে হেরিতেছি অমরা-ভবন,
প্রভো! তব মহাধারামাঝে করি প্রাতঃ-
স্নান।

২

তব মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান,
অসহ্য শোকের বোঝা দিনু বিসর্জ্জন;
এই যে নশ্বর দেহ, এ নয় আমার গেহ,
বড় সাধ পূজি সদা ঐ শ্রীচরণ
তব মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান।

৩

আজি, তব মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান,
অতীতের ব্যথারাশি হয় না স্মরণ;
এত যে আঁধার ঘন, এত যে বিচূর্ণ প্রাণ,
সকলি ভুলিয়া গেছি অসহ্য দাহন,
ঐ মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান।

৪

ঐ মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান,
বিচূর্ণ পরাণে পাই নবীন চেতন;
আমি কি মানুষ নই? পশুর অধম হই,
তোমার ও করুণা হেরি, পাব না চেতন,
ঐ কৃপাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান।

৫

প্রাতঃস্নান হয়ে গেছে, নবীন চেতনা
আমাকে দাও গো প্রভু, করি এ সাধনা;
আমি ত জীয়ন্তে মরা, হাহাকারে বুক ভরা,
এ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে দাও নবীন চেতনা,
মুছাইয়ে দাও ঘোর সংসার-তাড়না।

৬

প্রভো! নব রবি সনে দাও নবীন
চেতনা,
মুছাইয়া দাও ঘোর ভবের যাতনা;
হায়! আমি ঘুরে ঘুরে, ছাড়ি ঐ স্বর্গপুরে,
পেতেছি শ্মশান ভবে অসীম যাতনা,
এ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে দাও নবীন চেতনা।

৭

প্রভো! তব কৃপাধারামাঝে করি প্রাতঃ-
স্নান
শুভ্রবাস চাহিতেছে আকুল পরাণ—
উষার বিমল ভাতি দূর করে শোক ভীতি
পুরাতন পাপ তাপ দিব বিসর্জ্জন,
তব মহাধারামাঝে করি প্রাতঃস্নান।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

আমি "সুসংবাদ" শুনিবার আগ্রহাতিশয়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত সুষমা-সঙ্গ ছাড়িয়া মণিদিদির কাছে উপস্থিত হইলাম। মণিদিদি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আমার হাতে এক পত্র দিলেন। পত্রের শিরোনাম "শ্রীমতী মণিকা দেবী" দেখিয়া আমি আর না পড়িয়াই মণিদিদিকে পত্রার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম।

দিদিমণি বলিতে লাগিলেন, "পত্র পড়িয়া দেখ না কেন, বড়লাট ডফারিণ সাহেবের স্ত্রী চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে মেয়েরা একটী অভিনন্দন দিবেন, সেই জন্য মেয়েদের একটী সভা হইবে; সেই সভায় উপস্থিত হইতে সুরেশ দাদা তোমাকে ও আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন; বেলা বারটার সময়ে সুরেশ দাদা গাড়ী পাঠাইবেন; আমরা তাঁর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার ভগিনীর সহিত গেলে সুবিধা হইবে। এই কথাই পত্রে লিখিয়াছেন; আমিতো ভাই, কখনও মেয়েদের সভা সমিতি দেখি নাই, এবারে যদি তোমার কল্যাণে দেখিতে পাই বিনীতা, তাহা হইলে বড়ই, সুখী হইব"।

"তোমার অত অনুনয়ে আর কাজ নাই, রোসো দেখি" এই কথা বলিয়া, পত্রখানি হাতে লইয়া আমি আমার অভিভাবক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম।

অভিভাবক মহাশয় পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন; আমার পীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে নারীসমিতিতে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন। তবে আমার একান্ত ইচ্ছা হইলে সুরেশ ডাক্তারের

বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতে পারি, এতটুকু আশ্বাস দিলেন। মণিদিদির বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না। সুতরাং আমি পরম সৌভাগ্য মনে করিলাম।

এই সৌভাগ্য মনে করা আমার কেবলই পরার্থমূলক নহে; তার মধ্যে একটা স্বার্থও ছিল। যদি সুরেশ ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার বিবাহবিষয়ক—সুষমা-বিষয়ক কোন সংবাদ জানিতে পাই, মনে মনে সেই আশা জাগিতেছিল।

যথাযোগ্যরূপে প্রস্তুত হইয়া মণিদিদি ও আমি ঝির সহিত বেলা বারটার সময়ে ডাক্তারের বাড়ীতে চলিলাম। আমাকে সমিতিতে যাইতে না দেওয়া হয়, এ বিষয়ে আমার অভিভাবক মহাশয় সুরেশ বাবুকে সতর্ক করিয়া একখানি পত্র দিতে ভুলিলেন না।

যথাসময়ে ডাক্তারের বৃহৎ ও সুদৃশ্য বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বাবুর বিধবা ভগিনী সরোজিনী আমাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। একটী নির্জ্জন কক্ষে সুরেশ বাবুর মাতা একাকিনী বসিয়া, দেরাজ খুলিয়া কাপড় ভাঁজ করিতেছিলেন, আমরা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি কাপড়ের পুঁটুলি পিছনে রাখিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিলে প্রথমে মণিদিদি, পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদের সহিত দুই এক কথা বলিলে সরোজিনী আমাদিগকে অন্ত দিকে লইয়া চলিলেন।

একটী বারাণ্ডায় একটী ছোট মেয়ে, বয়স ছয় সাত বৎসর, আর একটী ছোট ছেলে বয়স চারি পাঁচ বৎসর বল্ লইয়া খেলা করিতেছিল; আর একজন সুন্দরী যুবতী—বুঝি সেই ছেলে মেয়ের মা, দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিলেন, আমাদিগের প্রবেশ মাত্র করধারণপূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা করিয়া গৃহমধ্যে বসিতে দিলেন।

ডাক্তার বাবুর ভগিনী এবং মাতার পরিচয় সরোজিনীর কাছেই পাইয়াছিলাম। এখন এই ছেলে মেয়ে এবং এই রমণীর পরিচয় জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইঁহারা ডাক্তার বাবুর কে হন?"

সরোজিনীর কথা বলার প্রণালী বড় মনোহর। নিতান্ত সহজ কথা বলিতেও কেমন এক রুপ রহস্য মাখাইয়া পরের আনন্দ ও হাস্য ফুটাইয়া তোলেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "এই দু'টি আপনাদের ডাক্তার বাবুর ছেলে মেয়ে, আর ইনি তাঁর গৃহলক্ষ্মী ললিতা দেবী।"

মণিদিদি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; ললিতাও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সত্য কথা বলি, আমার হাসি তামাস দূরে যাউক্, বাঙ্নিষ্পত্তিও হইল না।

সুরেশবাবু কি স্ত্রীপুত্রাদি সত্ত্বে সুষমাকে

গোপনে বিবাহ করিয়াছেন? আহা, সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, স্বর্গের সৌরভ, পবিত্রতার ছবি সুরেশ বাবু কি ছলনা করিয়া বিনষ্ট করিতেছেন? আমি সুরেশ ও সুষমার যে প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতো হীনতা, নীচতা অথবা পৃথিবীর কোনও পঙ্কিলতা সম্ভূত নহে; বিশেষতঃ সুরেশ বাবুর মত উচ্চাশয়, সদাশয়, মহামনা পুরুষরত্ন কখনই এমনতর নীচতা করিতে পারে না। অথচ এ বাড়ীতে সুষমার নাম পর্য্যন্ত করিবার সুযোগ দেখিতেছি না, কি করি?

আমাকে নির্ব্বাক্ ম্রিয়মাণা দেখিয়া ললিতা আমাকে বাতাস করিতে উদ্যতা হইলেন। সরোজিনী বলিলেন, "মাঘ মাসে আর পাখার হাওয়া দিতে হবে না; তোমাদের রোগীকে একটু প্রফুল্ল কর"। আমার জন্য তাঁহাদিগকে এ রকম ব্যস্ত হইতে দেখিয়া আমি লজ্জিতা হইলাম; মনে মনে নিজেকে বড়ই অপরাধী বোধ হইতে লাগিল। তখন সকল চিন্তা চাপা দিয়া তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খানিকক্ষণ পরে সরোজিনী একজন ছোকরা চাকরকে বাড়ীর কর্ত্তা সুরেশ বাবুর পিতার নিকটে মহিলা-সভায় যাইবার অনুমতি প্রাপ্তি জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

চাকর ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আর সকলকে যাইবার জন্য বলিয়াছেন, কেবল বউমাকে যাইতে মানা করিয়াছেন"। "বউমা" ললিতা।

সরোজিনী ও ললিতার মুখ একটু অপ্রসন্ন দেখিলাম। যাহাহউক, সরোজিনী, সুরেশ বাবুর মাতা, মণিদিদি সকলে সমিতি দেখিতে চলিয়া গেলেন। আমি ললিতা দেবীর নিকটে রহিলাম।

এই পরিবারের অমায়িকতা ও সৌজন্যে আমার হৃদয় বড়ই তৃপ্ত হইতেছিল।

(ক্রমশঃ)

দুর্ভিক্ষ-চিত্র।

২ নং।

(বিদ্যাসাগর।)

১

দুটী ভিক্ষা দাও,—
অভাগী কাঙ্গালী আমি, নাই বাপ, নাই স্বামী,—
তিন কুলে কেহ মোর নাহিক কোথাও।
ছোট দুটী ছেলে মেয়ে মরিছে, না খেতে পেয়ে,
এক মুঠা ভাত দিয়া তাদের বাঁচাও।
সারাদিন পথে পথে, বেড়ায়েছি কোন মতে

দুজনে দু কাঁধে নিয়ে, বৃথা হ'ল তাও,
কেহত দিল না হায়! দুটী অন্ন দুজনায়,
সবাই তাড়ায় শুধু "দূর" "দূর" "যাও"!
বহিতে পারি না আর, দুইটী শিশুর ভার,
লতিয়ে পড়েছে তারা দয়া ক'রে চাও,
আমাদের মুখ পানে ;—কঠিন নিঠুর প্রাণে
তুমিও যেও না ফেলে মোদের বাঁচাও!
দুটী খেতে দাও।

২

পরাণ কেমন করে বাঁচি না ক্ষুধায়,—
দুদিনের উপবাসে পাঁজর ভাঙ্গিয়া আসে
দাঁড়াতে পারি না আর, করি কি উপায়!
অভাগীর শিশু দুটী, মাটীতে পড়েছে লুটি,
চাহিতেও পারেনা গো! হায়! হায়! হায়!
দুদিন পায়নি অন্ন, কচি দেহ অবসন্ন,
খাবে ব'লে কেঁদে উঠে, বুক ফেটে যায়!
কি দিয়া আশ্বাস দিব? কত আর বুঝাইব?
হায় রে! ক্ষুধার পেট ভরেনাক আর!
হারে ও দারুণ বিধি! এমন অমূল্য নিধি
দিয়াছিলি অভাগীরে কোন্ করুণায়?
দারুণ জঠরানলে আজ তারা মরে জ্বলে
মা হয়ে এমন দশা কত দেখা যায়?
ওদেরে ফেলিয়া রেখে, মরিতেও ভয় ঠেকে,
আমি গেলে কে দেখিবে শিশু দুজনায়?
আর ত সহে না বুকে, করি কি উপায়?

৩

সারাদিন ঘুরিয়াছি কত ঘরে ঘরে,
কোন খানে এক মুট অন্ন না উঠিল জুটি
যার কাছে যাই, সেই পরিহাসভরে,
কুকথা কুবাচ্য বলে,—ফিরে আসি, অশ্রুজলে
ভেসে যায় বুক, আর বাছাদের তরে
কলিজা ফাটিয়া আসে, দাঁড়ায়ে কলের পাশে
অঞ্জলি পূরিয়া জল দেই দুজনারে!
অকরুণ কলিকাতা, দরিদ্রের বন্ধু ভ্রাতা
নাহি কেহ কোন খানে এ পোড়া নগরে।
শুধু ইট, শুধু কাঠ, শুধুই নবাবী ঠাট,
দেখে না দুয়ারে যদি কেহ পড়ে মরে!
করুণা-মমতা-শূন্য, নাই ধর্ম্ম নাই পুণ্য,
তাদের সর্ব্বস্ব শুধু আপনার তরে!
সারাদিন বেড়ায়েছি এ পোড়া নগরে!

৪

শুনেছি লোকের কাছে হে বিদ্যাসাগর!
কেবল তুমিই নাকি দেখিলে সজল আঁখি,
থাকিতে পার না স্থির, তোমার অন্তর
শুনেছি দয়ায় গড়া, মার মত স্নেহভরা,
তাই আসিয়াছি শেষ তোমার গোচর।
অতি ভয়ে সন্তর্পণে, আসিয়াছি তিন জনে
ভাবিয়া একটী কথা মনে লাগে ডর,
"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়"
কি জানি কপাল-দোষে শুকায় সাগর!
এ কথা ভাবিয়া মনে লাগিতেছে ডর।

৫

দয়ার সাগর তুমি, বলেছে সবায়,
জিজ্ঞাসিয়া জনে জনে, তাই তব দরশনে
আসিয়াছি অভাগিনী শেষ ভরসায়!
দয়া যদি হয় প্রাণে, এক মুষ্টি অন্ন দানে,
বাঁচাও এ শিশু দুটী, বাঁচাও আমায়।

নতুবা দুয়ারে তব, আমরা পড়িয়া রব,
যাবৎ পরাণ পাখি উড়িয়া না যায়!
পাঁজর ভাঙ্গিয়া আসে, বল নাই গায়!

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা চন্দ্র।

কেন আমি নিরামিষাশী?

মুক্তি ফৌজের প্রধান নায়ক ব্রামওয়েল বুথ সাহেব নিরামিষ ভোজনের পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন—

(১) আমি ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর নিরামিষ ভোজন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(২) বাইবেলের মতে ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য নিরামিষ আহার স্থির করেন।

(৩) নিরামিষ আহার ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধির অনুকূল।

(৪) নিরামিষ আহার দৈহিক বলবীর্য্যের পোষক। পুরাকালে স্পার্টা ও রোমদেশীয় সৈন্যগণ পরাক্রমে সকল জাতির শ্রেষ্ঠ ছিল। নিরামিষ আহারই তাহার কারণ।

(৫) সহস্র সহস্র লোক দুর্মূল্য মাংসাহারের পরিবর্ত্তে ফলমূল আহার করিলে সংসারের অন্যান্য ব্যয় সহজে সংকুলান করিয়া দরিদ্রের দুঃখমোচনের ও ঈশ্বরের অনুমোদিত অন্যান্য কার্য্যের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতে পারে।

(৬) নিরামিষ আহারের উপযোগী যব, গম, চাউল, মটর প্রভৃতির মূল্য মাংসের মূল্যের সহিত তুলনা করিলে তদপেক্ষা দশ গুণ কম। মাংসে আবার অর্দ্ধেক জল, সুতরাং, মাংসের মূল্য দিয়া জল কিনিতে হয়।

(৭) নিরামিষ আহার প্রচলিত হইলে অকারণ অনেক জীবহত্যা নিবারিত হইতে পারে।

(৮) নিরামিষাশীর মদ্যপানের আসক্তি কম হয়। মাংসাহারের আধিক্য সুরাপানের আধিক্যের কারণ। এক কুপ্রবৃত্তি অন্য কুপ্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক।

(৯) মাংসাহার করিলে লোক আলস্য, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা প্রভৃতি নানা রোগের বশতাপন্ন হয়। নিরামিষ আহার শ্রমোপজীবিকার ও শ্রমশীলতার সহায়।

(১০) যাহারা অল্প বয়স হইতে ফলমূলাদিভোজনে অভ্যস্ত, তাহারাই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী। নিরামিষ আহারই সুখ স্বচ্ছন্দ ও স্বাস্থ্যের প্রধান সাধন।

(১১) মাংসাহার মনুষ্যের পাকযন্ত্রের বিশেষ উপযোগী নহে। মাংসাহার জন্য দেহের শোণিত দূষিত হয় ও তন্নিবন্ধন অজীর্ণতা ও বাত প্রভৃতি নানা রোগ আসিয়া পড়ে।

(১২) অনেক সময়ে, বিশেষতঃ

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস বহুক্ষণ ভাল থাকে না ও শীঘ্র বিকৃত হইয়া যায়। অথচ সেই মাংসই ভক্ষিত হয়। এরূপ মাংস কখন পুষ্টিকর হইতে পারে না।

(১৩) অনেক সময়ে রুগ্ন ও বৃদ্ধ পশুর মাংস বিক্রয় হয়। লোকে সহজে ভাল মন্দ মাংস বিচার করিয়া লইতে অক্ষম। সুতরাং অধিকাংশ লোক অহিতকর রুগ্ন পশুর মাংস আহার করিয়া রোগগ্রস্ত হয়।

(১৪) Consumption ও cancer প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য অনেকগুলি রোগের আধিক্য মাংসাহারের ফল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। নিরামিষ আহার করিলে অনেক পরিমাণে এই সকল রোগের ভয় থাকে না।

(১৫) সহস্র সহস্র পশুকে রেলপথে ও জাহাজে করিয়া আনা হয়। তাহারা সেই সময়ে নানা কষ্ট পায়। কি মনুষ্য, কি পশু, কোন প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে।

(১৬) এই সকল পশুকে আবার হত্যা করিবার পূর্ব্বে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়া হয়। বিশেষ কষ্ট না দিয়া অর্থাৎ সত্বর প্রাণনাশ করাও নিষ্ঠুরতার কর্ম্ম। অবৈধ ও ক্লেশকর উপায়ে প্রাণিবধ কতদূর নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য তাহা বলা যায় না।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

মেহগনী তরুর প্রতি।

আজি মনে পড়ে সেই দিন যবে তরুবর!
ফুল সাজে সেজেছিলে শোভার আকর!
তেমনি ত সব আছে—আছ দাঁড়াইয়া,
তবুও তোমাকে হেরি কেন কাঁপে হিয়া?
কত যে সংগ্রাম-ক্ষত এ ভগ্ন হৃদয়—
এ সংসারে কেহ তাহা বুঝিবে না হায়—
ঘোর বজ্রাঘাত স'য়ে পাষাণের চিতে
আবার এলেম তরু! তোমারে হেরিতে।
যাঁহার প্রীতির তরে করিয়া যতন
রচিয়াছি কবিতার হার সুচিকণ,
কোথা হায় আজ তিনি? সেই অধিস্বামী
তোমা হেরি অশ্রুজলে ভাসিতেছি আমি।
দুজনে তোমাকে সদা বরেছি আদরে,
বিদিয় আশীষ কত লভিয়াছি শিরে,
তোমারি ছায়ায় তাঁর, বাণী অনুপম
হৃদয়ে জাগায়ে দিত আশা মনোরম।
এ ছায়াতে বসি মোরা মহাশিল্পিলীলা
ভাবিয়াছি হেরিয়াছি নিসর্গের খেলা।
উপাস্যের চরণেতে হৃদি দিছি পেতে,
কিছুই পাইনি ভয় ঘোর দুর্দ্দিনেতে।
আজো তরু! চেয়ে আছ নীলাকাশপানে,
আমিও দেখিতে চাই এ আঁধা নয়নে—
অমরার চিত্র—হায় শুধুই কুয়াসা,
পিয়াসী এ পরাণের নাহি মিটে তৃষা।

আজি তেমনি ফুলের বাসে বরাঙ্গ ঢেকেছ,
তেমনি উপাস্য তরে প্রেমাশ্রু ঢালিছ,
শুরু। মোর কিছু নাই—নাহি অশ্রুকণা,
অন্ধদেশে চলিয়াছি যে পথ অজানা,
ও পারেতে পৌছিবারে হৃদি উচাটন,
শমন কাটে না হায় খাঁচার বন্ধন।
সব চলে গেছে মম সেই রবি সনে
পাখাও যে নাহি হায় উড়িব বিমানে।
কবে হবে শুভদিন বল তরুবর।
অমরা উদ্যানে পশি জুড়াবে অন্তর।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

বল্লুজী চম্পাবৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একজন দ্রুতগামী দূত বল্লুজী চম্পাবতের হস্তে এই পত্র প্রদান করিল। তিনি ইহা পাঠ করিবামাত্রই ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

তিনি বজ্রনির্ঘোষে আদেশ করিলেন,—"আমার সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে বল।" তখনই তাঁহার আদেশে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ সজ্জিত হইল, এবং তাহাদিগের অগ্রে বল্লুজী অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। তিনি শিবির পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন সময়ে মেবারের মহারাণার দূতগণ তাঁহার প্রেরিত সেই উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-ঘোটকটী লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নায়ক বল্লুজীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "হে রাজপুত-বীরচূড়ামণি বল্লুজী চম্পাবৎ! আর্য্যবংশরবি মহারাণা আপনাকে এই তেজস্বী ঘোটকটী প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনি ভিন্ন ইহার জন্য কোন উপযুক্ত আরোহী খুঁজিয়া পাইলেন না।" ইহা বলিয়া তাহারা রাণার পত্র তাঁহাকে প্রদান করিল। বল্লুজী তাহা পাঠ করিয়া কতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তাঁহার নিজের অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া মেবারের প্রদত্ত সেই তেজস্বী ঘোটকের উপর আরোহণ করিলেন এবং মহারাণার উদ্দেশে বলিলেন,—"হে রাজপুতরাজ! আপনিই ধন্য! আপনিই রাজপুতগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আপনার এই অমূল্য উপঢৌকন শুভফল সূচনা করিতেছে।" তিনি সেই দূতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"তোমরা দেখিতেছ আমি গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাত্রা করিয়াছি, সে জন্য একটুও বিলম্ব করিতে পারি না। আমি তোমাদের মহাত্মা প্রভুর নিকট পত্র লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময় পাইলাম না। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে বলিও, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই উপঢৌকন গ্রহণ করিলাম, এবং

ভবিষ্যতে যদি মুসলমানের অস্ত্র দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হন, তবে আমার রাজপুত-শোণিতের দ্বারা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,"বাঁচি কি মরি" আমি নিশ্চয়ই তাঁহার উপকার করিব, একজন মনুষ্য দ্বারা যাহা সম্ভব, আমি তাঁহার জন্য তাহা করিব। সেই দিন আমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিব।"

ইহা বলিয়া তিনি ভাঁজীর শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহাকে সাদরে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন--

"ভ্রাতঃ! আমাদিগকে দুইটী কাজ করিতে হইবে; একটী আগরা দুর্গ হইতে নাগররাজের মৃতদেহ আনয়ন করা; দ্বিতীয়টী চিতা সজ্জিত করা, যাহাতে আরোহণ করিয়া আমাদের রাণীজী তাঁহার স্বামীর সহমৃতা হইবেন। এই দুইটী কার্য্যের মধ্যে আপনি কোন্‌টী করিতে ইচ্ছা করেন? আমি তাহার অন্যটী করিব। আপনি সত্বর বলুন, বিলম্ব সহে না।"

ভাঁজী উত্তর করিলেন—"আপনি আমার চেয়ে বড় যোদ্ধা, আপনি সেই মৃতদেহ উদ্ধারের ভার গ্রহণ করুন। আমি এ দিকে তাঁহার সৎকারের যথোচিত আয়োজন করি।"

বল্লুজী বলিলেন,—"তাহাই হউক।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া আগরা দুর্গের ফটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরুভার কাষ্ঠের সাহায্যে শীঘ্রই সেই দুর্গদ্বার ভগ্ন করা হইল। সেই সৈন্যদল পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিয়া অমনি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যে মুক্ত প্রাঙ্গণে সেই অসংস্কৃত ও অবজ্ঞাত শব পতিত ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। বল্লুজী সেই মৃতদেহ তুলিয়া তাঁহার ঘোটকের গলার উপর বাঁধিলেন এবং পশ্চাতে তাঁহার দুইশত সৈন্য রাখিয়া যে স্থানে ভাঁজী দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন। সেখানে চিতা সজ্জিত ছিল; রাণী সেই চিতার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বল্লুজী সেই মৃতদেহ চিতার উপর স্থাপন করিলেন; সেই মৃত মস্তক সতীর জানুর উপর রক্ষিত হইল। বল্লুজী ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি সৎকার করিতে উপদেশ দিয়া ভাঁজীর সৈন্যদলের সহিত তাঁহার নিজের সৈন্যদল মিলিত করিলেন এবং যে সকল মুসলমান সৈন্য দ্রুতবেগে সেই চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে আসিতেছিল, তাহাদের উপর বজ্রবেগে পতিত হইলেন। সেই প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুপক্ষ হটিয়া গেল; কিন্তু হাজার হাজার সৈন্যকে আট শত মাত্র লোক কি প্রকারে পরাজয় করিবে? তাহারা কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল। সেই দুই বীর ভ্রাতা, যে সময়ের মধ্যে শবের সৎকার শেষ করা যাইতে পারে, সেই কালটুকু পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষকে পরাভব করিয়া রাখিবার জন্য দুর্জ্জয় সাহসের সহিত তাঁহাদের

সাহসিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিলেন। ইহার অতিরিক্ত সময় তাঁহারা চান নাই। অবশেষে তাঁহারা সর্ব্বশরীরে ক্ষতচিহ্ন লইয়া উভয়ে পতিত হইলেন এবং উদ্বিগ্ন-মনে পশ্চাতে সেই চিতার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের সাহসের দ্বারা সব কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে"। সেই বীরপুরুষদ্বয়ের হর্ষোৎফুল্ল চক্ষু পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। অমনি তাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হইল। সেই এক সহস্র সাহসী রাজপুত সৈন্যের মধ্যে একটীও জীবিত রহিল না। কিন্তু দেহ নষ্ট হয়, বীরের কীর্ত্তি নষ্ট হয় না।

সম্রাট্ সাহজাহান বল্লুজী কর্ত্তৃক ভগ্ন দুর্গদ্বার আবার ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ফেলিলেন। সেই দ্বার অমরসিংহের দ্বার নামে পরিচিত হইল। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জর্জ্জ ষ্টিল্ সেই দ্বার পুনরুদ্ঘাটন করেন।

আগরার বাহিরে বল্লুজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন। বীর্য্যবান্ রাণা পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইলেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার পশ্চাদ্ গমন করিতে করিতে দৈবারী প্রবেশ করিল। তখন এই ঘোর বিপদের সময় বল্লুজীর সেই পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা অনেকে রাণাকে স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন—"মৃত ব্যক্তি কিরূপে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে?" কিন্তু রাজপুত সত্যরক্ষার জন্য যমদ্বার হইতেও ফিরিয়া আসিতে পারেন। রাণা এই কথা বলিতে বলিতে, ঐ দেখ! কি একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। বল্লুজীর পরিচ্ছদধারী একজন অশ্বারোহী একটী উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিলেন এবং দুর্জ্জয় পরাক্রমের সহিত তিন ঘণ্টা কাল যুদ্ধ করিয়া দৈবারী হইতে তাহাদিগকে কতক সমরকৌশল দ্বারা, কতক ভীতি-সঞ্চার দ্বারা বাহির করিয়া দিলেন, এবং নিজে সেই দুর্গদ্বারে পতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। দৈবারীতে এখনও একটী দাগপড়া ভাঙ্গা ছত্রী দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার উপরে বিলুপ্ত অক্ষরে লেখা আছে—"এখানে মহাত্মা বল্লুজী চম্পাবৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ।

আর্য্যদিগের রন্ধনশাস্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্নাতশ্চন্দনচর্চ্চিতঃ সুবসনঃ স্রগ্বী প্রসন্নাননঃ
স্পষ্টাত্মা সুভগঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ শ্রীকান্তপূজারতঃ।
স্বামিস্নেহপরঃ স্বপাকনিপুণঃ প্রৌঢ়ো বদান্যঃ শুচিঃ
বিপ্রো বা পরিবেশকস্তু কুলজশ্চান্যোঽপি বা ভূপতেঃ॥

(পাকরাজেশ্বরঃ।)

অনুবাদ। যিনি স্নান করিয়া গায়ে চন্দন মাখিয়াছেন, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন ও (গলায়) পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার মুখ প্রসন্ন, যিনি অকপটস্বভাব, দুর্ভাগ্যহীন, প্রসন্নচিত্ত, বিষ্ণুপূজারত, প্রভুর প্রতি স্নেহপর, পবিত্র পাককার্য্যে দক্ষ, প্রৌঢ়বয়স্ক, দানশীল, পবিত্র, এইরূপ ব্রাহ্মণ অথবা অন্য সংকুলোদ্ভব (যাহার অন্ন ভক্ষণ করা যাইতে পারে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদিগের মধ্যে এইরূপ সংকুলোৎপন্ন) মহাত্মা, ভূপতির পরিবেশক হইতে পারেন। (পূর্ব্বে পাচকেরা পাক করিয়া দিলে এইরূপ পরিবেশকেরা রাজাকে পরিবেশন করিত; স্থলবিশেষে পাচক স্বয়ংও পরিবেশক হইত।)

স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী
কর্পূরসৌরভমুখী নয়নাভিরামা।
বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা
মন্দস্মিতা:ক্ষিতিভৃতাং পরিবেশিকা স্যাৎ॥
(পাকরাজেশ্বরঃ।)

অনুবাদ। যিনি স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়াছেন, তৎকালে যাঁহার দেহ অগুরুযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, যাঁহার মুখে কর্পূরের সৌরভ থাকাতে মুখানি কোনও অঙ্গে দুর্গন্ধ থাকে না, যিনি কুরূপা নহেন, যিনি বিম্বাধরা, যিনি মস্তকে সুগন্ধ পুষ্প বদ্ধ করিয়াছেন, যিনি মন্দস্মিতা অর্থাৎ বিষণ্ণমুখী নহেন, এইরূপ (নিজ স্ত্রী, নিজ স্ত্রীর সখী বা অনুরক্তা সৎকুলোদ্ভবা পরিচারিকা) স্ত্রীলোকের মহারাজগণের পরিবেশিকা হওয়া উচিত।

পূর্ব্বোল্লিখিতানুরূপগুণসম্পন্ন পাচক প্রভৃতি রন্ধনশালায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে উক্ত বিদ্যার উৎকর্ষচিন্তায় আর্য্যগণ কিরূপ মনোযোগী ছিলেন। বেদ ও উপনিষদের সময়েও যে এ দেশে গুণবান্ পাচকগণ রন্ধন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"অথহশৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ
কাক্ষসেনীং।
পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা
উহনুদদতু॥"
ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ।৪প্র।৩খ।

অনুবাদ। একদা কপিবংশীয় শৌনক, অভিপ্রতারী এবং কাক্ষসেনী ইঁহারা ভোজনার্থে উপবেশন করিতেছিলেন। এমন সময়ে কোন ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্নভিক্ষা করিয়াছিলেন। (তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্মচারী মনে করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।)

উল্লিখিত উপনিষদের উক্তাংশে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বেও পাচকগণ সদ্বংশীয় ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের গৃহে রন্ধন ও পরিবেশন করিতেন।

পূর্ব্বে রন্ধনবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি গ্রন্থও প্রণীত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রণীত "অন্নদা-স্থপ" নামে একখানি রন্ধনবিদ্যার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল। পরে নিষধাধিপতি প্রসিদ্ধ রন্ধনশাস্ত্রবিৎ

মহারাজ নল, ঐ গ্রন্থের সাহায্যে এবং স্বয়ং অনেক বিষয় উদ্ভাবিত ও নূতন সংযোজিত করিয়া "নল-সূপ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন আবার ঐ উভয় গ্রন্থের সাহায্যে "ভীমসূপ" পুস্তক রচনা করেন। ভীমসেন যে রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, অজ্ঞাতবাসকালে রন্ধন-কার্য্য বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি, পটুতা ও খ্যাতিই তাহার প্রমাণ। উজ্জয়িনীর অধিপতি বিখ্যাত বিদ্যানুরাগী মহারাজ বিক্রমাদিত্য সুতপা নামে একজন পণ্ডিত দ্বারা "বিক্রমসূপ" নামক গ্রন্থ রচনা করান। ঐ গ্রন্থখানি গদ্য ও পদ্যে লিখিত। হস্তলিখিত বিক্রমসূপ গ্রন্থের ৮।১০ পৃষ্ঠা ছিন্ন অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। সংপ্রতি রন্ধনবিদ্যা বিষয়ে কেবল "পাক-রাজেশ্বর" গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে পরিবেশক ও পরিবেশিকার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। "পাকরাজেশ্বর" পুস্তকখানিও নিতান্ত আধুনিক নহে। উহার অনেক শ্লোক প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

মহাপ্রভাবশালী আকবর সাহা যৎকালে দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন, তখন তিনি হিন্দুদিগের অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। ঐ সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ অনুবাদের সহিত তিনি "বিক্রমসূপ" প্রভৃতি গ্রন্থের অবলম্বনে "ভহকতেল হিন্দু" নামক একখানি পাক-শাস্ত্র প্রণয়ন করান। ঐ গ্রন্থের অবলম্বনেই যবনেরা রন্ধনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ বিষয়ের উন্নতি করিতে থাকে। সুতরাং যবনেরা পাক-শাস্ত্র সম্বন্ধে সংপ্রতি উন্নতিলাভ করিলেও, হিন্দুশাস্ত্র হইতেই যে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

রন্ধনশাস্ত্রগুলি এক্ষণে এ দেশে দুষ্প্রাপ্য হইলেও প্রাচীন সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র ও অভিধানের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পাকশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেও প্রসঙ্গক্রমে রন্ধনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে সেই কথাগুলির বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

রন্ধনশাস্ত্র উপেক্ষার বিষয় নহে। উহা চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পর্কশূন্য নহে ও বিজ্ঞানের যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কেবল গ্রন্থপাঠে রন্ধনবিদ্যা শিক্ষা হয় না। উহা অভিজ্ঞ পাচক ও রন্ধনবিদ্যা-ভিজ্ঞা স্ত্রীলোকদিগের নিকটে কার্য্যতঃ শিক্ষাই শিক্ষা। রন্ধন সকলেই করে, অথচ অনেকেই রন্ধন করিতে ভাল জানে না। ইহার কারণ,—সামান্য বিষয় বলিয়া উক্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ। রন্ধনবিদ্যা গ্রন্থে বর্ণিত থাকিলে তাহা দেখিয়া শিক্ষার সুবিধা অল্প হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে যত অধিক গ্রন্থ ও

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, ততই উক্ত শাস্ত্র-শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে আর্য্য পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যে ঐ শাস্ত্রের আলোচনা এক প্রকার রহিত হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ পাচকভৃত্যের শিক্ষণীয় বলিয়া ঐ বিষয়ের উন্নতি করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষাই করিতেছেন। রন্ধনশাস্ত্র যদি নিন্দাকর হইত, তবে দ্রৌপদী, রুক্মিণী প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ঐ শাস্ত্রের অনুশীলনে যত্নবতী হইবেন কেন? মহাভারতে সত্যভামার সহিত আলাপপ্রসঙ্গে দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন,—"আমি পূর্ব্বকালে বা বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজভবনে স্বয়ং রন্ধন কার্য্য করিতাম।" সহস্র সহস্র পাচক প্রত্যহ যে মহারাজাধিরাজগণের গৃহে রন্ধন করিতেন, ঐ বিদ্যা ভৃত্যের আলোচনীয়া বলিয়া উপেক্ষার বিষয় হইলে সেই সমস্ত রাজচক্রবর্ত্তিগণের গৃহিণীগণ উক্ত বিদ্যায় শিক্ষিতা ও পারদর্শিনী হইতেন না। বলা বাহুল্য যে, আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে কোন গৃহস্থ সেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় উন্নত-অবস্থাপন্ন এবং রাজমহিষী দ্রৌপদীর ন্যায় ধনী গৃহস্থের রমণী নহেন। পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ও রাজরাজেশ্বরীগণ আদরপূর্ব্বক যে রন্ধনবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিতা বুঝিয়া উহার অনুশীলন করিতেন, এ দেশের গৃহস্থ ও গৃহিণীগণ কি তাহা স্মরণ করিবেন? বর্ত্তমান অজ্ঞাতকুলশীল মূর্খ ও অপবিত্র পাচকদিগের অনুগ্রহলাভ ও তাহাদের হস্তে জীবনসমর্পণের অভ্যাসটী কি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন!

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ
ও পুরাণতীর্থ।

হিন্দুস্ত্রীলোকের জীবনপ্রণালী।

হিন্দুস্ত্রীলোকগণ, ধর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিয়া, যে যে কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করা সকলেরই অবশ্য উচিত। ধর্ম্মই জগতের সার বস্তু। কেননা মৃত্যুর পর ধর্ম্মই মনুষ্যের অনুগামী সুহৃদ্, এতদ্ব্যতীত অপর সমস্তই শরীরের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হিতোপদেশ-কর্ত্তা নিম্ন শ্লোকে ইহাই লিখিয়াছেন,:—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥

ধর্ম্মজীবন ব্যতীত মনুষ্যের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ বিধি ব্যতীত হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কতকগুলি স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পাতিব্রত্যই প্রধান ধর্ম্ম। পতিই হিন্দু

স্ত্রীলোকগণের পরম দেবতা; পতিতে ভক্তি রাখিয়া, পতির বিশ্বাসিনী হইয়া, পতির সহিত ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধ করিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সমগ্র হিন্দুস্ত্রীলোকের পক্ষে বিধেয়। হিন্দু স্ত্রীলোকেদিগের যে সকল অভিধা আছে, তন্মধ্যে 'সহধর্ম্মিণী' ও 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' এই দুইটাই সর্ব্বপ্রধান। পতির অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া পতির সুখে সুখিনী—পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী এবং পতির অর্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভাগিনী হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করাই প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পতি যাহাতে ধর্ম্মপথে থাকিয়া, দেশের, সমাজের ও পরিবারবর্গের প্রতি ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে পতিকে পরামর্শ প্রদান করিতে হিন্দুস্ত্রীলোকগণ কোন মতেই বিস্মৃত হইবেন না। পতি যদি ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে অগ্রসর হন, তদ্দর্শনে পত্নী উদাসীন থাকিলে, কিংবা স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সেই বিষয়ে প্ররোচনা দিলে, পত্নীকেও পতির পাপের অংশভাগিনী হইতে হয়; অতএব সৎপরামর্শ দ্বারা পতিকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীলোকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন "কার্য্যেহপি পত্নী মন্ত্রী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ। স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাৎ বেশ্যা চ শয়নে শুভা।" পতি যদি মোহান্ধ হইয়া পত্নীকে বিষম অত্যাচারে উৎপীড়িত করেন, পত্নী ক্রোধ, দুঃখ এবং অভিমান সংযমপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কুব্যবহার বা কটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধীরতার সহিত অবিচলিতভাবে পতির সেবা যত্ন করিয়া তাঁহার প্রিয়া হইতে চেষ্টা করিবেন। এমন অনেক কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুস্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদিগের স্বামী চরিত্রহীন ও বিপথগামী হইলে, তাঁহারা এতদূর হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া পড়েন যে, কতকগুলি অজ্ঞ প্রতারক অর্থলোলুপ লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া নানাবিধ বন্য বৃক্ষলতার বাকলমূল অর্থ দিয়া ক্রয় করত পতিকে সেবন করাইয়া, বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কিছুমাত্র সুফল ফলিতে দেখা যায় না, বরং নানাপ্রকার কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের একটী প্রবচন আছে,—"থাক সয়ে পাবে রয়ে।" অতএব অনর্থক ঐ সকল 'গুণতুক' না করিয়া সমস্ত কষ্ট ও উৎপীড়ন অটল ভাবে সহ্য করিয়া পতিকে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের পথে ফিরাইবার নিমিত্ত সর্ব্বমঙ্গলময় পরমব্রহ্মের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি একদিন না একদিন সেই কাতর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। পতি, পত্নীর মধ্যে সামান্য কোন বিষয়ে মতের দ্বৈধভাব হইলে, পত্নী নিজের প্রাধান্য রাখিবার নিমিত্ত পতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বীয় মতাবলম্বী হইতে জেদ করিবেন না। ইহাই দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত। দাম্পত্য

কলহে মন অশান্ত হয়, মন অশান্ত হইলে মনুষ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পতির সহিত একমত হইয়া সংসারিক, সামাজিক ও পারমার্থিক সকল কর্ম্ম সংসাধন করাই সমস্ত হিন্দুস্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত বিহিত।

হিন্দুস্ত্রীলোকগণ সংসারিক আয় অনুসারে অনুধাবনপূর্ব্বক ব্যয় করিবেন এবং সেই আয় অনুসারে যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন। নতুবা ভবিষ্যতে বিপদের সময় অর্থের প্রয়োজন হইলে অন্যের নিকট ঋণ করিতে হয়। ঋণজালে জড়িত হইয়া ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণী ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। অন্যের উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার দ্রব্য ইত্যাদি দেখিয়া তদনুরূপ বস্ত্রালঙ্কার দ্রব্যাদি লাভার্থে অক্ষম পতিকে বিব্রত করিলে, তিনি ঋণ করিয়া অথবা কোন নীচবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, নতুবা উপায়ান্তর নাই। এতাদৃশ অন্যায়ভাবে পতিকে পীড়ন করিলে, হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিয়া সুখ শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা হয় না। হিন্দুস্ত্রীলোকগণ সংসারে সুখ শান্তি সুশৃঙ্খলা রক্ষার্থ সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। হিন্দুদিগকে স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা ব্যতিরেকে অনেকগুলি জ্ঞাতি কুটুম্বকেও প্রতিপালন করিতে হয়। হিন্দু জাতির পাশ্চাত্যবাসীদিগের ন্যায় কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র লইয়া সংসার নহে। ইহাদের অসহায় অক্ষম জ্ঞাতি কুটুম্বের ভরণ পোষণ করিতে এবং তাঁহাদিগকে সংসারে আশ্রয় দিতে হয়। তাঁহাদিগের আহারাদি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রদানের ভার হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের উপর ন্যস্ত থাকে। যে হিন্দুস্ত্রীলোক সেই আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি ভক্তি, স্নেহ, সেবা, যত্ন করিয়া সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তাঁহারাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মজীবন অব্যাহত থাকে। এই পারিবারিক ভক্তি স্নেহ সেবা যত্ন করিতে করিতে মনুষ্য বিশ্বজনীন ঐ সকল ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ হিন্দুস্ত্রীলোক এই একান্নবর্ত্তিতার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গমনা করিয়া স্বার্থসুখের নিমিত্ত পতির সন্নিধানে আশ্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও তাঁহাদের নামে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগকে সংসার হইতে ভিন্ন করিয়া দেন। যাঁহারা বা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভরণপোষণ ও আশ্রয় দান করেন, তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভৃত্য ও মনিবের ন্যায় ব্যবহার করেন। এরূপ আচরণে আশ্রিত ব্যক্তিগণ বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন; কিন্তু শঙ্কায় সে ভাব গোপন করিয়া থাকিতে হয়। তাঁহাদের মনে এ প্রকার কষ্ট দিয়া ভরণপোষণ ও আশ্রয় দেওয়ায় কিছুমাত্র পুণ্যার্জ্জন হয় না; অধিকন্তু

অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। আশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং যত্নপূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সকল হিন্দু-স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু-স্ত্রীলোকগণ পুত্র, কন্যা ও সকল পুত্র-বধূকেই সমানভাবে স্নেহ যত্ন করিবেন। কাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক বা কিঞ্চিৎ ন্যূন করিলে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অবৈধ বিরোধ ভাব আসিয়া পড়ে। পুত্র জননীর প্রতি কুব্যবহার করিলে তাহা যে পুত্রবধূর পরামর্শেই করিতেছে, সে বিষয়ে নিজের চক্ষু কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে, বৃথা সংশয়ান্বিত হইয়া অকারণে বধূর প্রতি ক্রোধ বা কুব্যবহার করা আদৌ উচিত নহে। অন্যের প্রমুখাৎ কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া বিশ্বাস করা মহাপাপ। মাতা-পুত্রের বিবাদ কখনই অন্তরস্থ ও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু বধূ পরের কন্যা, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সত্য বা অমূলক কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে, একবার যে ক্রোধের ছায়া হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাহা ইহজন্মে অপনোদন করা অতিশয় দুরূহ হইয়া উঠে। বধূরা ননদ, জা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত যথাযোগ্য ভক্তি ও স্নেহপূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করিবেন, কদাচ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ক্রোধ বা হিংসার ভাবকে মনে স্থান দিবেন না। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত কোন প্রকারে বিবাদ হইতে না পারে, সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিবেন। তাঁহারা শ্বশ্রূকে ভক্তি সেবা করিবেন। যদি শ্বশ্রূর লাঞ্ছনা গঞ্জনা বা দুর্ব্যবহারে নিতান্ত অস্থির হন, তাহা হইলেও নিজের সুখ শান্তির নিমিত্ত স্বামীকে তাঁহার জননীর সহিত পৃথক্ হইয়া, সংসারী করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন না। তাহাতে শ্বশ্রূর মনে ভয়ানক আঘাত দেওয়া হয়। "মুনির শাপ মনস্তাপ" উভয়ই সমান। সুতরাং ভিন্নসংসারী হইলেও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় না। শ্বশ্রূর সন্নিধান হইতে তাঁহার পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। তাঁহারা শ্বশ্রূ, ননদ, জা কিম্বা ভ্রাতৃজায়ার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবেন, বধূ-কন্যারাও পরম্পরানু-ক্রমে সেই আদর্শে গঠিত হইবে। হিন্দু-স্ত্রীলোকগণ পরিবারস্থ কাহারও সহিত কোন বিষয় লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবেন না। একত্র বাস করিতে হইলে অনেকের অনেক উপদ্রবই সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সে সকল কথা স্বামীর কর্ণগোচর হইতে দেওয়া উচিত নহে। অধিকাংশ পুরুষই স্ত্রীর প্ররোচনাবাক্যে সাংসারিক কলহে মনঃসংযোগ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া পড়েন। হিন্দুস্ত্রীলোকগণ গৃহবিবাদে মন না দিয়া শিশুগণ যাহাতে ভবিষ্যতে ধর্ম্ম-জীবন অক্ষত রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদুপযুক্ত উপদেশ দিবেন। শিশুদিগের হৃদয় দর্পণ স্বরূপ, তাহার সমীপে ভালমন্দ যে চিত্র ধরিবে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হইবে। অতএব যাহাতে

তাহাদিগের বাল্যকাল হইতে নীতি, জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবেন।

হিন্দুস্ত্রীলোকগণ নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলার্থ সর্ব্বদা ব্রহ্মের চরণে মন সংযুক্ত রাখিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ দান, পরোপকার এবং অতিথিসৎকার। প্রত্যেক হিন্দুস্ত্রীলোক হৃষ্টচিত্তে যথাসাধ্য দান ও ক্ষমতানুযায়ী পরোপকার এবং অতিথিসৎকার করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। ইহাতে মনে শান্তি, আনন্দ ও পবিত্রতার উপলব্ধি হয়। সমস্ত হিন্দুস্ত্রীলোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত গৃহস্থালীর কর্ম্ম ও রন্ধনকর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত। পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। শরীর সুস্থ থাকিলে সমুদায় সৎকর্ম্ম অনায়াসে সাধন করা যায়। গৃহকর্ম্মসমাপনান্তে আত্মোন্নতির জন্য পুরাণ, ইতিহাসাদি জ্ঞানমূলক গ্রন্থ পাঠ করা হিন্দুস্ত্রীলোকদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু সধবা ও হিন্দু বিধবা উভয়ের ধর্ম্ম এক হইলেও সকল কর্ত্তব্য আবার সমান নহে। সধবার অনেকগুলি কর্ত্তব্য বিধবার পক্ষে পালনীয় বটে, কিন্তু বিধবার ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ, উপবাস ব্রতাদি পালন এবং অসূর্য্যম্পশ্যাভাবে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া যে সকল জ্ঞাতি কুটুম্ব রোগীর পরিচর্য্যা করা যুক্তিসঙ্গত, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা ও সর্ব্বদা কর্ম্মে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি কতকগুলি অতিরিক্ত কর্ত্তব্য আছে। আবার বিধবার পক্ষে অনেকগুলি ত্যাগস্বীকারও প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয় দমন, ভোগবিলাস ও আমোদ উৎসবাদি বর্জ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় নিয়ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিয়মগুলি প্রথমতঃ অতি কষ্টকর হইলেও উহা ক্রমশঃ অভ্যাস বশতঃ সকলেরই সহ্য হইয়া যায়। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।

ইলিয়ড।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় স্বর্গ।

নিদ্রা অন্তে নরপতি ত্যজিলা যখন
সুশয্যা; তখনো যেন ধ্বনিতে আছিল
সুস্বরে স্বপনবাণী শ্রবণে তাঁহার।
পালিবারে সসম্ভ্রমে যোভের আদেশ

* ইলিয়ড প্রথম স্বর্গ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া অনেক দিন বন্ধ ছিল। আমরা ইহা পুনরায় প্রকাশ করিতে পারিব আশা করি।

তাজিয়া শিবির শূর চলিলা যথায়
বিরাজে সমরসাজে গ্রীক বীরদল।
হেরি দিনদেবে এবে প্রভাতিতে আসি
উদিত অচল পরে ত্রিদিবে মরতে
বিতরি কিরণশিখা, আদেশিলা ডাকি
দূতদলে নরপতি আহ্বানিতে ত্বরা
সমরমন্ত্রণা হেতু সসৈন্য সদলে
সর্ব্ব গ্রীক যোদ্ধৃবৃন্দে সমীপে তাঁহার।
নৃপাদেশে দলে দলে সর্ব্ব অগ্রে যবে
প্রবীণ রথীন্দ্রবৃন্দ সুশোভিলা আসি
সভাদেশে; নরপতি সম্বোধি সকলে
কহিলেন, স্বপ্নকথা বিবরি এরূপে—
"শুন সর্ব্ব মিত্রগণ! আজি নিশাকালে
দেখিনু স্বপনে নেসটোর রূপ ধরি
যেন কেহ আসি দাঁড়ায়ে শিয়রদেশে
কহিলা আমারে—'হে আট্রিয়াসপুত্র!
ঘুমাইছ তুমি! এ নহে উচিত কার্য্য
নৃপেন্দ্রের কভু কাটাইতে সারানিশি
সুখনিদ্রাকোলে; শুন এবে মোর কথা—
যোভের প্রেরিত দূত বলি মোরে জেন।
যদিও ত্রিদিবধামে বসতি তাঁহার,
তোমার মঙ্গলচিন্তা চিন্তেন সতত
তবু দেবপতি; আদেশ দেছেন তোমা
সুসজ্জিত করি সর্ব্ব গ্রীক বীরদলে
আক্রমিতে ট্রয়পুরী, কারণ এখন
জুনোদেবী অনুরোধে দেবগণ সবে
একমত হয়েছেন ট্রয়-নিপাতনে।
ট্রয়জান ভাগ্যপটে ফলিছে এখন
নিদারুণ শোকতাপ আসন্ন মরণ।
যোভের আদেশ এই রাখিও স্মরণে
নিদ্রা অন্তে হে নৃপতি, এতেক কহিয়া
অদৃশ্য হইলা স্বপ্ন। এস মোরা সবে
যোভদেব-আজ্ঞামত সসৈন্য সদলে
আহ্বানিয়া গ্রীকবৃন্দে করি সুসজ্জিত
আক্রমিতে ট্রয়পুরী রণসাজে ত্বরা।"
এতেক কহিয়া নৃপ বসিলা যখন
সভামাঝে; তবে পাইলেন-অধিপতি
নেসটোর উঠি কহিলেন এইরূপে,—
"মিত্রগণ রাজগণ! যদি অন্য জন
কহিতেন এই মত স্বপ্ন-বিবরণ;
মিথ্যা বলি সুনিশ্চিত ভাবিতাম মোরা।
কিন্তু নৃপ-দৃষ্ট এই স্বপনকাহিনী
অবিশ্বাস করিবার নাহিক কারণ।
এস মোরা সবে আহ্বানিয়া গ্রীকদলে
করি সুসজ্জিত রণসাজে ত্বরা করি
আক্রমিতে ট্রয়পুরী অজেয় জগতে।"

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

হেলির ধূমকেতু।

আমরা ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪৭২ সংখ্যা ও তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা পত্রিকায় হেলির ধূমকেতুর বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ঐ ধূমকেতু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট হইয়াছিল। জ্যোতির্ব্বেত্তারা ঐ ধূমকেতুর পুনরুদয় প্রত্যাশায় আকাশপথে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে দুই তিন বৎসর নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, সংশোধিত গণনানুসারে ঐ ধূমকেতু ৭৫ বৎসরে আপনার কক্ষভ্রমণ পরিসমাপ্ত করে। পূর্ব্ব গণনায় ৭৬ বৎসর নিরূপিত হইয়াছিল। সুতরাং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উহা পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইবে। ধূমকেতুরা সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহাদের ঔজ্জ্বল্য ও গতি বৃদ্ধি হয়। সম্প্রতি কাওয়েল ও ক্রম্মলিন নামক দুইজন জ্যোতির্ব্বিৎ হেলির ধূমকেতুর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদয়ের পর হইতে যেরূপে তাহার কক্ষগতির হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহা গণনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ধূমকেতুদিগের কক্ষগতি এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী যে, এ পর্য্যন্ত কয়েকটী ব্যতীত তাহাদের অনেকের গতি নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, কোন কোন ধূমকেতু ১৫৪৩ বৎসরে এবং কোন কোনটী ২৮৮৮ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কেবল একটী ধূমকেতু, যাবেলাম্বিয়াহার আবিষ্কার করিয়াছেন সেইটী, ৭ বৎসরে কক্ষভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাহাদের সূর্য্য হইতে দূরত্বও বিস্ময়কর। যে ধূমকেতুটীর ২৮৮৮ বৎসরে কক্ষভ্রমণ শেষ হয়, সূর্য্য হইতে তাহার দূরত্ব ১৬০০০ কোটী মাইল। হেলির ধূমকেতুর সূর্য্য হইতে দূরত্ব ৩৪০ কোটি মাইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দেও কয়েকজন জ্যোতির্ব্বেত্তা এইরূপ গণনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হেলির জীবদ্দশায় নেপচুন্ এবং ইউরেনস্ গ্রহদ্বয় আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং গণনারও জটিলতা বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কাল হইতে কোন কোন গ্রহের আকর্ষণে ঐ ধূমকেতুর গতি মন্দ হইয়াছে, তাহা প্রাগুক্ত জ্যোতির্ব্বেত্তৃদ্বয় গণনা করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, ৭৫ বৎসরে ধূমকেতুটী পুনরুদিত হইবে। তাহাদের গণনায় এই ফল হইয়াছে। যথা,—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর আকর্ষণে তাহার কক্ষগতি ১৮ দিন হ্রাস হইয়াছে; শুক্রের আকর্ষণে ঐ গতি ৯ দিন বৃদ্ধি হইয়াছে, বৃহস্পতির আকর্ষণে প্রায় ৬৪০ দিন হ্রাস হইয়াছে, অন্যান্য গ্রহের দ্বারা গতির বড় পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতএব তাঁহারা আশা করেন যে, ধূমকেতুটীর কক্ষগতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত হইবে। ক্রমলিন অনুমান করেন যে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে দিবসে উহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে। ইতঃপূর্ব্বে ঐ ধূমকেতু সূর্য্যমণ্ডলের সন্নিকটস্থ না হইলে কেহ উহাকে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু ডাক্তার হোলেটশ্চেক্ নামক জার্ম্মন্ জ্যোতির্ব্বেত্তা বলেন যে, সম্ভবতঃ এই বৎসরের নবেম্বর মাসে ধূমকেতুটী এরূপ উজ্জ্বল হইবে যে, তাহার ফটোগ্রাফ লইতে পারা যাইবে, যদিও তখন উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। তিনি বলেন যে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যে একটী ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঔজ্জ্বল্য যদিও হেলির ধূমকেতু অপেক্ষা অল্প ছিল, তথাপি দেখা গিয়াছিল।

হেলির ধূমকেতু নবেম্বর মাসে তদপেক্ষা সূর্য্যের দূরে থাকিবে না। তাহাদের এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত যদি সফল হয়, তাহা হইলে সাত বৎসর হেলির ধূমকেতু জ্যোতির্ব্বেত্তারা তাহাদের দূরবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিতে পাইবেন। তাঁহারা আরও আশা করেন, বিগত শতাব্দীতে মধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে যত জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, এই ধূমকেতু দ্বারা তদপেক্ষা অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গমহিলার হিমালয়ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

৩০শে সোমবার প্রভাত-সময়ে স্বভাবের শান্তিপূর্ণ ছবি প্রাণে নব উৎসাহ ঢালিয়া দিল। আজই গৃহে পঁহুছিয়া বন্ধুবান্ধব ও সন্তানদের স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিব, ভাবিতে ভাবিতে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিতেছে। একটী ক্ষুদ্রস্রোতা নদী পুলবাজার বহিয়া কুলুকুলু শব্দে চলিয়াছে, আমরা তাহার নির্ম্মলজলে মুখ ধৌত করিয়া তৃপ্ত হইলাম। পুলবাজার পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত; আকাশ-ভেদী পর্ব্বতমালা চারিদিকে মস্তক তুলিয়া রহিয়াছে। নদীর মধ্যে একখানা পাষাণ-খণ্ডে বসিয়া চারিদিকের নীরব সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইলাম। পূর্ব্বদিবসের পথ-শ্রান্তির জন্য অনেকেই শীঘ্র শীঘ্র যাত্রার জন্য প্রস্তুত নহেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত, প্রতি মুহূর্ত্ত আমার নিকট দীর্ঘ সময় বোধ হইতেছে; যাত্রীদিগের প্রস্তুত হইবার বিলম্ব দর্শনে অধীর হইয়া পড়িতেছি। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর যাহার যে পরিষ্কার বস্ত্রাদি অবশিষ্ট ছিল, তাহা পরিধান ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সকলেরই সহাস্য মুখ। বেশভূষার পারি-পাট্য দর্শনে কে মনে করিতে পারে যে, আমরা এত কষ্টরাশি অতিক্রম করিয়াছি। ঘোড়াগুলি আরোহী পৃষ্ঠে লইয়া সগর্ব্বে বন্ধুর পার্ব্বতীয় পথে উপরে উঠিতেছে। আরোহিগণের কে আগে যাইবেন, বাজী রাখিয়া তাঁহারা বেগে ঘোড়া চালাইতে-ছেন। ডাণ্ডিওয়ালাগণও আমাকে লইয়া খুব ছুটিয়াছে। আমি সকলের অগ্রে, পশ্চাতের সহযাত্রীদিগকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ক্ষুদ্র পর্ব্বতবাহিনী দুইটী নদী পার হইয়া চাক্ষেত্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এখন কেবল সোজা উপরে উঠিতে হইল। ঘোড়াগুলি ঘামে যেন স্নান করিয়াছে। চাক্ষেত্রের কুলিগণ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া আমাদের বৃহৎ দলটী ভালরূপে দেখিবার জন্য নিকটে আসিয়া

দাঁড়াইতেছে। আমরা কোথা হইতে আসিলাম বারবার কেবল এই একই প্রশ্ন। ক্রমে দার্জ্জিলিং সহরের গৃহগুলি মালার ন্যায় দৃষ্ট হইল। আমাদের হৃদয়ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। প্রায় ১টার সময়ে গৃহে পঁহুছিলাম। সন্তান ৩টীকে নিরাপদ ও সুস্থ দেখিয়া যে অসীম আনন্দ জন্মিল, তাহা প্রকাশ করা অসাধ্য। এতদিন দুঃখ কষ্ট ভোগের পর গৃহের মূর্ত্তি কি মধুর বোধ হইতেছে। প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই সর্ব্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরচরণে হৃদয় প্রণত হইল। সর্ব্বত্র তাঁহার দয়ার নিদর্শন দেখিয়া কৃতজ্ঞতাভরে হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ দেহে আবার সকলে একত্রিত হইলাম, একথা যত ভাবি, ততই মন কৃতজ্ঞতাসাগরে ডুবিয়া যায়।

ফেলুট হইতে জীবন্ত প্রত্যাগত হইয়াছি শুনিয়া বন্ধুবান্ধব অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণে আমাদের দ্বিগুণ আনন্দ জন্মিল। সন্ধ্যা-বেলা ওজন হইতে গিয়া জানিলাম, এক-সপ্তাহের পরিশ্রমে শরীরের ভার ⁄৫ সের কমিয়াছে। এজন্য একটুও দুঃখিত নহি। প্রকৃতির মহান্ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের চক্ষে যে একটা দোষ জন্মিয়াছে, তাহা বলা উচিত।

এখন দার্জ্জিলিং সহরের জলা পাহাড়, অব্‌জারভেটরী হিল প্রভৃতি পর্ব্বত বলিয়াই মনে হয় না। রাস্তাগুলি সমতল বোধ হইতেছে ; এ পথে দিন রাত্রি চলিলেও যে ক্লান্তি বোধ হইতে পারে, এমন বোধ হয় না। রাস্তার বাহির হইলে হাসি পায়। ফেলুট হইতে প্রত্যাগত হওয়ার কয়দিন পরে বার্চ্চ হিল পার্কে ৯টী সহযাত্রী একত্রিত হইয়া বনভোজন করিলাম। পথের নানা গল্প করিতে করিতে দিনটা পরম সুখে চলিয়া গেল। একটা দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়াছি বলিয়া আমাদের বিলক্ষণ সম্মান বাড়িয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আমার মনে একটুও গর্ব্বের ভাব আইসে না।

পাঠক মনে করিবেন না আমার এ ভ্রমণকাহিনী অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জিত দূরে থাকুক, যেরূপ অভাবনীয় প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও ধৈর্য্যবলে অপরাজিতচিত্তে দার্জ্জিলিং প্রত্যাগত হইয়াছি তাহা বাস্তবিকই স্মরণযোগ্য। মন কষ্টে একটুও দমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, সুবিধা পাইলে আবার আজি "ফেলুট" যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। জীবনে আবার কি তেমন আনন্দের দিন আসিবে?

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

খুল্লনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এদিকে ধনপতি সদাগর এক বৎসর গৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার কালে পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে পারেন নাই বলিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাহার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন,—পিতৃকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সে কালের হিন্দু সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের অগ্রে পিতৃমাতৃকার্য্য সমাপন করিতেন, তাহাতে উপেক্ষা করিতেন না। সদাগরও পুরোহিতের কথা অবহেলা করিতে না পারিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশ বিদেশের বেণিয়া নিমন্ত্রিত হইয়া যথাকালে ধনপতির গৃহে উপস্থিত। শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা হইল, ধনপতি কুটুম্বসম্বর্দ্ধনায় অগ্রসর হইয়া চাঁদ সদাগরের গলে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনতিলক অর্পণ করিলেন। ইহাতে শঙ্খ-দত্ত নামে একজন বণিক্ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—“বণিক্‌সভায় আমার মান অগ্রে—ধূসদত্ত যে কালে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন, তিনি ষোলশত বণিকের মধ্যে আমাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেন, তিনি এখানে উপস্থিত।” ধনপতি বলিলেন, “সে কালে চাঁদ সদাগর ছিলেন না, থাকিলে তিনিই সম্মানিত হইতেন।” এই কথায় সমাগত বণিক্‌দের মধ্যে দুই দল হইল। কথা কাটাকাটিতে নীলা-ম্বর দাস নামে জনৈক বণিক্ ধনপতির হৃদয়ে ব্যথা দিয়া বলিল—

জাতিবাদ নহে ভাই যদি হয় বন্ধ।
বনে জায়া ছেলী রাখে এ বড় কলঙ্ক॥

ক্রমে এই কথা লইয়া বড়ই গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিল। খুল্লনার ছাগরক্ষণ ও বনে বনে যদৃচ্ছ ভ্রমণের কথা তুলিয়া তাঁহার অন্নগ্রহণে কেহই সম্মত হইল না—সকলেই খুল্লনার পরীক্ষার কথা তুলিল। এই সময়ে ধনপতি লহনাকে যারপর নাই তিরস্কার করিয়া খুল্লনাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। খুল্লনা পরীক্ষার কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ঐজন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বণিক্‌সভায় খুল্লনার পরীক্ষার আয়োজন হইতে লাগিল। খুল্লনা প্রাণমন এক করিয়া দেবী মহামায়ার স্তবস্তুতি পাঠ করিলেন। পরীক্ষায় তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। ভগবতী অম্বরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। সভায় দেশবিদেশের যাবতীয় বণিক্, বহুল ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপবিষ্ট হইলেন। সামান্য হইতে গুরুতর পরীক্ষা আরম্ভ হইল—খুল্লনার জীবন সংশয়াপন্ন। মাল বৈদ্যকে দিয়া দুই বিষধর সর্প আনয়ন করা হইল, তাহাদিগকে কলসীমধ্যে পুরিয়া তাহাতে একটী অঙ্গুরী নিক্ষিপ্ত হইল। খুল্লনা তাহা হইতে অঙ্গুরী তুলিয়া লইলেন। তাহাতে বণিক্‌সম্প্রদায়ের তৃপ্তি হইল না। অতঃপর প্রস্তাব হইল —শাবল-পরীক্ষা। কর্ম্মকার আসিল,

শাল পাতিল—লোহার শাবল তপ্ত হইয়া বালারুণের স্থায় দীপ্তি ধারণ করিল—খুল্লনা সেই প্রদীপ্ত শাবল হস্তে ধারণ করিলেন, শাবল তাঁহার হস্ত দগ্ধ করিল না। তাহাতেও বণিক্‌গণের অনেকের তুষ্টি জন্মিল না। অবশেষে জতুগৃহমধ্যে খুল্লনাকে রাখিয়া তাহা দগ্ধ করিবার প্রস্তাব হইল। তাহাতেও খুল্লনা ম্লানমুখী নহেন। জতুগৃহ নির্ম্মিত হইল। খুল্লনা কায়মনোবাক্যে দেবী ভগবতীকে স্তব করিলেন।

বণিক্‌সমাজের অনুমতিক্রমে খুল্লনা জতুগৃহে (গালায় নির্ম্মিত ঘরে) প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত করা হইল। জৌগৃহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্ত্রীপুরুষ দর্শকগণ হাহাকার আরম্ভ করিল, "খুল্লনা আর নাই—দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।" এই সময় ধনপতি শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানিল না। তিনি অগ্নিকুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। বন্ধুগণে ধরিয়া রাখিল। ক্রমে অগ্নিশিখা ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অন্তরীক্ষের অগ্নি অবনী স্পর্শ করিল। সাধ্বী সতী খুল্লনা সুন্দরীও অগ্নি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি জ্ঞাতিবন্ধুগণের সম্মুখে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইলে শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন; এবং শত্রুপক্ষীয়দিগের মস্তক অবনত হইল।

অতঃপর খুল্লনা রন্ধন করিলেন, বণিক্-সমাজ তাহা পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ করিয়া অনেকেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। কর্ম্মসমাধান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ধনপতি একদিন রাজদর্শনে গমন করিলেন। তখন রাজবাড়ীতে পুরাণ পাঠ হইতেছিল। তাহাতে চন্দনদানের অমোঘ ফল হয় শুনিয়া রাজা ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসিলেন ভাণ্ডারে কত চন্দন আছে। ভাণ্ডারী বলিল, "বহুকাল পূর্ব্বে চন্দন আমদানি হইয়াছিল, বিশ বৎসর হইল রঘুপতি দত্ত মারা গিয়াছেন। তিনি চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর কেহ আনেন নাই। সুতরাং তাহাতে আর চলিবে কেন?" এই সময়ে ভাণ্ডারী আরও কতকগুলি বৈদেশিক দ্রব্যের অভাব জানাইল। রাজা ধনপতি দত্ত সদাগরকে ডাকাইবার উদ্যোগ করিতে-ছেন, এমন সময় তিনি উপঢৌকন লইয়া রাজদর্শনে উপস্থিত।

তখনই রাজাজ্ঞা হইল—তাঁহাকে বিদেশীয় পণ্য সংগ্রহ জন্ত সিংহল যাত্রা করিতে হইবে। ধনপতি প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এ বারের যাত্রা কালবিলম্বসাপেক্ষ—কারণ এদেশীয় পণ্য সংগ্রহ না হইলে যাইবার

উপায় নাই। বিশেষতঃ অনেক দিন বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ। বাণিজ্যতরী-গুলির কোনটী জীর্ণ, কোনটী ভগ্ন, কোনটী বা এককালে অ ব্যবহার্য্য। সেই সকলের সুব্যবস্থা জন্য সময়ের প্রয়োজন। ধনপতির গৃহস্থালীর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লহনা কপট প্রেম প্রকাশপূর্ব্বক অনেক কথাই বলিল। বাণিজ্যযাত্রা নিতান্ত আবশ্যক, "বসিয়া খাইলে নদীর বালি আঁটে না" ইহাও বলিল। কিন্তু খুল্লনা মর্ম্মে মরিয়া রহিলেন। সদাগরকে সিংহলযাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—"রাজ-ভাণ্ডারে যে সকল জিনিষের অভাব, তাহা আমাদের নিজ ভাণ্ডার হইতেই মিটিতে পারে. সিংহলের অবস্থা বড়ই শোচনীয়—সেখানে জলে মকরের, স্থলে শার্দ্দূলের ভয়, মশার আকার শশার মত—জলোকাগুলা হস্তিশুণ্ডের মত বড় বড়। সে দেশে কষ্টই সব। রাজা বড়ই পাপমতি—বিদেশীয় বণিকের ধন অর্থ ছলে বলে কাড়িয়া লয়। এই সকলের পর আত্মকাহিনীতে তিনি সদাগরের চিত্ত দ্রব করিয়া দিলেন। সদাগর সে সকলের সদুত্তর করিতে পারিলেন না, মনের কথা মনেই রাখিলেন। পতিব্রতার প্রাণের ব্যাকুলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুদুঃখিতমনে নীরব রহিলেন। খুল্লনা তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্রাণপতি নিরুপায় হইয়াই যে প্রবাসযাত্রা করিতেছেন, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। অবশেষে তিনি লজ্জা পরিহার-পূর্ব্বক আপনার ছয় মাস গর্ভধারণের কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া এবং লহনার পাপ প্রবৃত্তির বিষয় অবগত হইয়া তিনি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিলেন—"প্রাণাধিকে শ্রীমতি খুল্লনা সুন্দরি! সম্প্রতি তুমি ছয় মাস গর্ভবতী। আমি রাজাজ্ঞাক্রমে বাণি-জ্যার্থে সিংহল যাইতেছি। যদি তোমার গর্ভে কন্যা জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম রাখিবে 'শশিকলা'। উত্তম পাত্র দেখিয়া তাহাকে সম্প্রদান করিবে। আর পুত্র জন্মিলে, 'শ্রীপতি' নাম রাখিবে। তাহাকে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইবে। দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে যদি ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে আমার অন্বেষণার্থে তাহাকে সিংহলে পাঠাইয়া দিবে।" তাহার পর একটী মাণিক্যাঙ্গুরীয়ক নিদর্শন স্বরূপ তিনি খুল্লনার হস্তে দিলেন।

অতঃপর বাণিজ্যদ্রব্যজাত সংগৃহীত হইতে লাগিল, দৈবজ্ঞ আসিয়া যাত্রার দিন স্থির করিলেন। নিকটে ভাল দিন মিলিল না। যে দিন স্থির হইল, তাহাতে যাত্রা করিলে বন্দী হইতে হয়। অগত্যা তাহাই স্থির হইল। বাণিজ্য-তরীগুলি অজয় নদের "ভ্রমরা" নামক দহে অনেক দিন হইতে ডুবান ছিল, তোলা হইল। এখন যেমন সাহেবদের অর্ণবপোতের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, আমাদেরও সেইরূপ ছিল। ধনপতি সদাগরের তরীগুলির নাম—"মধুকর," "দুর্গাবর," "গুয়ারেখী," "শঙ্খচূড়," "চন্দ্রপাল" "ছোটমুটী"—

এই সকল অর্ণবপোতের সাজসজ্জা বড়ই মূল্যবান্, উহার বসিবার ঘরগুলি সোণা রূপায় মোড়া;—অতীব স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক। এইরূপ সাতখানি পোতের অঙ্গরাগ ও জীর্ণসংস্কার হইল।

ক্রমে সদাগরের সিংহলযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। খুল্লনা স্বামীর শুভযাত্রার জন্য শুভঙ্করী ভগবতীর পূজা ও স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। সদাগরের বিরাগ জন্মাইবার জন্য লহনা তাঁহাকে বলিল, "খুল্লনা ডাকিনী দেবতার উপাসনা করিতেছে। তাহাতে কোন মতেই কল্যাণ হইবে না।" লহনা বড়ই চতুরা। স্বামী শিবভক্ত জানিত। যাহাতে স্বামীর ক্রোধোদ্দীপন হয়, তাহা বুঝিয়া খুল্লনার চণ্ডীপূজাকে ডাকিনীপূজা বলিয়া বুঝাইয়া দিল। সদাগর খুল্লনাকে প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু ডাকিনীপূজার কথায় তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি লহনাকে সঙ্গে লইয়া খুল্লনার পূজাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, খুল্লনার যথোচিত নিগ্রহ করিয়া পদাঘাতে দেবীর ঘট ফেলিয়া দিলেন, খুল্লনার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রহার করিতেও ক্রটি করিলেন না। সদাগরের এ হেন পাশব প্রকৃতির দৃষ্টান্ত কখন দেখা যায় নাই। ধীরপ্রকৃতি সদাগরের এরূপ কুপ্রবৃত্তি যেন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। খুল্লনা স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন। দেবী ভগবতী কল্যাণী, সকলের কল্যাণ করিয়া থাকেন। দেবগণ আপৎকালে তাঁহার আশ্রয় লয়েন। তিনি ভিন্ন বিপদ্ উদ্ধারের আর কেহই নাই। এজন্য তাঁহাকে দেবনর সকলেই বিপত্তারিণী বলিয়া জানে। আমি তোমার বাণিজ্যে লাভ এবং নিরাপদে প্রত্যাগমন জন্য দুসন্ধ্যা দুবেলা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি। এইরূপে অনেক বিনয় অনুনয় করিলেন। কিন্তু সদাগর সে কথা মানিলেন না, দেবীর ঘট উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। দেবী মহামায়া ক্রোধে অগ্নিপ্রায় প্রজ্বলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধনপতির বিনাশসাধনার্থ ভূত প্রেত ও দানাগণকে আহ্বান করিলেন। দেবীর সহচরী পদ্মা প্রতিনিবৃত্ত না করিলে তৎক্ষণাৎ সদাগরের বিনাশসাধন হইত। পদ্মা বলিলেন—"আপনার, পূজা প্রচারের জন্যই রত্নমালার ও মালাধরের মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ। এ সময় সদাগরের সংহারসাধনে ঈপ্সিত কার্য্যে ঘোর অন্তরায় ঘটিবে," ইত্যাদি। দেবী শান্ত হইলেন—সদাগর শিবস্মরণে সাতখানি তরী খুলিয়া সিংহলে যাত্রা করিলেন। অজয় বাহিয়া ভাগীরথী। ভাগীরথীর মোহানার নিকট মগরা নামক স্থানে সদাগরের পোতগুলি উপস্থিত হইলে দেবী ভগবতী সেখানে প্রবল ঝড়, বিদ্যুৎস্ফুরণ, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত করিয়া কেবল মাত্র মধুকরনামক জাহাজ রাখিয়া আর ছয় খানি তরী জলে ডুবাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

মীরাবাই।

মীরাবাই মর্ত্তানামক জনপদের একজন সামান্ত রাজার কন্তা ছিলেন। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহাকে স্বামিগৃহে বাস করিতে হয় নাই। মীরা কৃষ্ণভক্তা, কিন্তু তাঁহার শ্বশ্রূ দেবীভক্তা ছিলেন। তাঁহার শ্বশ্রূ তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করিয়া দেবীর আরাধনা করিতে বলেন, কিন্তু মীরা তাহাতে সম্মতা না হওয়ায় রাণার গৃহ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশ্রূ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতেও ক্রটি করেন নাই। কথিত আছে, মীরা স্বীয় চরিত্রের নির্ম্মলতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত স্বামিপ্রদত্ত বিষ পান করিয়াও যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না, তখন রাণা তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মীরা এখন স্বাধীনভাবে তাঁহার উপাস্ত দেব শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন, এবং বৃন্দাবন, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে মীরার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আকবরসাহ ও তদীয় সংগীতাধিনায়ক তানসেন্ মীরার সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহার খ্যাতি সমূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মীরার দোঁহা সকল নানক ও কবীরপন্থীদিগের দোঁহার সহিত গীত হইয়া থাকে।

মীরা বল্লভাচারী সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র নামে পূজা করিয়া আপনি একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তাঁহার উপাস্ত দেবতাকে তিনি রণছোর নাম দিয়াছিলেন, এবং তাহার একটী স্বতন্ত্র মন্দির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মীরার মৃত্যু (অন্তর্দ্ধান) সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত গল্প আছে। তিনি দ্বারকাতীর্থ হইতে উদয়পুরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করেন—

১। হে রণছোর প্রভো! দ্বারকা আমার যেন বাসস্থান হয়। তোমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম যমভয় দূর করুক। তোমার পবিত্র মন্দির অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ। তোমার শঙ্খ ও করতালের ধ্বনি কি মধুর! আমি আমার প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার সম্পত্তি, রাজ্য এবং স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে তোমার করিয়া লও।

২। যদি তুমি আমাকে নিষ্কলঙ্ক জান, তবে সেইরূপে আমাকে গ্রহণ কর। তুমি ব্যতীত আর আমাকে অনুকম্পা করিবার কেহ নাই। অতএব তুমি আমাকে কৃপা কর; জড়তা, ক্ষুধা,

দুশ্চিন্তা এবং অশান্তি যেন আমাকে দগ্ধ না করে। প্রভু গিরধারী, তোমার প্রিয় ভক্ত মীরাকে গ্রহণ কর; তাহাকে পরিত্যাগ করিও না।

এইরূপে প্রার্থনা করিলে পর রণছোড়দেব মুখব্যাদান করিলেন, এবং মীরা ঝম্প প্রদান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ অন্তর্দ্ধান হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্মরণার্থ উদয়পুর নগরে মীরাবাই এবং তাঁহার ইষ্ট দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, এবং উভয়েরই পূজা হয়।

মীরাবাইকৃত অনেক গাথা আছে, তন্মধ্যে একটী সংগীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কালহাংড়া—তাল ঠুংরি।

হরি সে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই। আরে তেরি বিগাড়ি বাত বনি যাই।

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই; শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মিরা বাই।

দৌলৎ দুনিয়া, মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চরাই; এক বাৎকে ঠাণ্ডা লাগে, খোজ খবর নেহি নাই।

অ্যায়সি ভক্তি কর ঘট্ ভিতর, ছোড়ো কপট চতুরাই; সেবা বন্দেগি আওর অধীনতা, সহজে মিলি গোসাঞী।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে, স্বর্গীয় আচার্য্যদেব মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাভূষণ সেন গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, এবং স্বদেশভক্ত জমিদার রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর গত ২৩শে অগ্রহায়ণ বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ ইঁহাদের আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

২। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সস্ত্রীক ও অমাত্যগণ সহ যখন কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ রেলপথে ভয়ানক শব্দ হইয়া লৌহবর্ত্মের কতক অংশ চূর্ণ হইয়া যায়। ঈশ্বরকৃপায় গাড়ী কিম্বা আরোহীর কোন অনিষ্ট হয় নাই। দোষীর অনুসন্ধান চলিতেছে। রেলের কর্ত্তৃপক্ষ এবং পুলিস উভয়েই পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

৩। বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২৬।২৭ ও ২৮শে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুরাটে কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে মাদকনিবারণী সভার, এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে একেশ্বরবাদী সভার অধিবেশন হইবে।

৪। পরলোকগত শ্রীযুক্ত রজনী নাথ

রায়ের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রজতনাথ রায়ের সহিত ভূতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী সুরমা সুন্দরীর শুভবিবাহ ২৭শে অগ্রহায়ণ তদীয় কলিকাতাস্থ ভবনে, এবং পরলোকগত শ্রীযুক্ত কালীনাথ দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহিত কুচবেহার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালার শুভবিবাহ ২৮শে অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। বিলাত হইতে পার্লামেণ্টের সভ্য ডাক্তার রথারফোর্ড ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তিনি পঞ্জাবের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য একণে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

৬। কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের হুকুমে কলিকাতার প্রকাশ্য স্থলে দুই মাস কোন সভাসমিতির অধিবেশন বন্ধ ছিল। দুই মাস অতীত হওয়াতে পুনরায় নবোৎসাহে সভাসমিতি আরম্ভ হইয়াছে।

৭। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শ্রীযুক্ত সেখ মহম্মদ ইক্বাল, এম, এ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সুইডেনের রাজা গত ৮ই ডিসেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নরপতিদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

স্বর্গীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী গত ২৮ শে অগ্রহায়ণ ৮৯ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বামারচনা।

কাশীধামে কোচবিহারের মহারাজের কালী বাড়ী।

১

নন্দনকানন তুল্য কালিকার ঘর,
চমৎকার, চমৎকার,
কত চিত্র চারি ধার,
নেহারিলে মন্ত্রমুগ্ধ সম হয় নর।

২

শুদ্ধতায় স্বর্গ সম এই কালীবাড়ী
অলকা অমরা সম,
সৌন্দর্য্য অপরিসীম,
জীবন্ত আনন্দ যেন হয় ভীতিহারী।

৩

দুইটী করবী তরু নবোঢ়ার মত,
কালিকার গৃহদ্বারে,
শোভে পত্রপুষ্পভারে,
মন্দ মন্দ গন্ধবহে সদা আন্দোলিত।

৪

চারি ধারে থরে থরে, কত যে মন্দির,
সে সব মন্দিরে কত,
আছে শিব প্রতিষ্ঠিত,।

সুসজ্জিত, পরিষ্কৃত ভিতর বাহির।

৫

নিত্য নিত্য অপরাহ্নে কালীর গোচরে
ভক্তগণ ভক্তিভরে
ভাগবত পাঠ করে,
সুধা বর্ষে শ্রোতাদের শ্রবণবিবরে।

৬

ভাবুকের ভাব সম নানাজাতি ফুল
উদ্যানে উদ্যানে শোভে,
অলি ভ্রমে মধুলোভে;
সন্ধ্যা, প্রাতে পরিমলে মানব আকুল।

৭

ছোট ছোট পাতা গাছে লতায় গাঁথনী
বাগানের চতুর্দ্দিকে,
কে যেন দিয়েছে এঁকে,
কে যেন খেলিছে খেলা, মরিরে বাখানি।

৮

নিত্য হয় কালিকার ভোগবিতরণ,
কুচবিহারের রাজা,
করিয়া কালীর পূজা,
করেছেন ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ।

৯

যদিও সে মহারাজা নাই এ ধরায়
তথাপি এ কীর্ত্তি তাঁরে,
রাখিবে অমর করে,
কালীর মানুষ তাঁর যশোগীত গায়।

শ্রী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

ভৈরবী-সৈকতে।

১

হে ভৈরবী! তব ওই সৈকত বেলায়,
জীবন-প্রভাতকাল গিয়াছে কাটিয়া।
মধ্যাহ্ন-জীবনে পুনঃ এসেছি হেথায়,
সংসারের আবিলতা হৃদয়ে মাখিয়া।

২

কত শ্যাম সন্ধ্যাবেলা আসি তব তটে,
হেরেছি বায়ুর খেলা উর্ম্মিমালা সনে।
ভাসিত চাঁদিনী তব বক্ষ চিত্র-পটে,
অতীতের শত কথা পড়ে আজি মনে।

৩

সেই তুমি, সেই আমি, কিন্তু আজি হায়!
আনি নাই সাথে করি সে সরল প্রাণ।
হতাশ বেদনা ভার বহিয়া মাথায়,
এসেছি শুনিতে তব মধুমাখা গান।

৪

তুমি গো তেমনি আছ সেই কল তানে—
চঞ্চল লহরী মালা দুলাইয়া বুকে।
আগ্রহে চলেছ ছুটি অম্বুনিধি পানে,
জুড়াতে হৃদয় আহা! মিলনের সুখে।

৫

তেমনি করিছে খেলা তব শ্যাম জলে,
অসংখ্য লহর তুলে ধীর সমীরণ;
শতধা চূর্ণিত হয়ে পড়িতেছে গলে,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি চন্দ্রিমা-কিরণ।

৬

দুকূলে হাসিছে কত ফুলবালাগণ।

মাঝিরা গাহিয়া সারি যাইতেছে চলি।
হীরক দেউটী জ্বালি তারা অগণন,
তোমার চঞ্চল বুকে পড়িতেছে ঢলি।

৭

উচ্ছ্বাসে আনন্দে তুমি যেতেছ বহিয়া
কিন্তু মোর কোথা আজি সেই সুখ দিন?
সংসার ঝঞ্ঝার আজি বিপন্ন হইয়া,
দাঁড়াইয়া আছি দেখ ধূলাতে মলিন।

৮

ঝিল্লী মুখরিত এই চাঁদিনী সন্ধ্যায়,
জ্বালাময় দুঃখগাথা লিখি বক্ষপটে।
শৈশবের সুখ স্বপ্ন হেরিতে তোমায়,
দাঁড়ায়ে রয়েছি তব বালুময় তটে।

৯

ফেলিয়া তোমার বুকে নয়ন আসার,
এসেছি জুড়াতে আজি দগধ পরাণ।
ক্ষণ তরে যদি যায় বিষাদের ভার,
শুনিয়া তোমার ওই মৃদু কল তান।

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে।

এ কি শুনিলাম আজ এ অশুভ ক্ষণে
হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে
শত বজ্রশিখা জ্বলে,
হরেছে কৃতান্ত হায়! সে বন্ধু সুজনে।
যাঁহার অমর গান
গাইছে হৃদয় প্রাণ
যাঁহার সুযশে পূর্ণ হয়েছে ভুবন,
সেই ভকতপ্রধান
কর্ম্মবীর নিষ্ঠাবান্
বুঝিতেন পরদুখ দুখীর বেদন।
সেই আদর্শ চরিত্র
সুনির্ম্মল সুপবিত্র
সুজনতা-পূর্ণ যাঁর অমিয় ব্যাভার,
বিবেচক বিচক্ষণ
বিজ্ঞ, সুকৃতী সুজন
নরদেহে নরদেব সর্ব্বগুণাধার,
মধুর প্রকৃতি যাঁর
সুমধুর ব্যবহার
বিধাতার প্রিয় পুত্র ধার্ম্মিকপ্রধান।
যাঁর স্নেহ ভালবাসা
হৃদয়ে আনিত আশা
শোক দুঃখ মাঝে শান্তি করিত প্রদান।
তাঁর স্নেহ তাঁর কথা
উপদেশপূর্ণ গাথা
মধুর মূরতি তাঁর মধুর আচার;
আজ তাহা পড়ে মনে
হর্ষ আসে আনমনে
হরষ-বিষাদ-মাখা হৃদয় আমার,
সরলতা কোমলতা
পরিপূর্ণ সুজনতা
কি মধুর ভালবাসা দেখেছি তাঁহার!
আদরেতে স্নেহভরে
মোর ক্ষুদ্র ভাইটীরে
প্রতিদিন শিখাতেন মিষ্ট ব্যবহার,
প্রতিদিন হাতে ধরে
লইতেন সঙ্গে করে

বিদ্যালয়ে কর্ম্মস্থানে যাইবার কালে
আবার ছুটীর পরে
গৃহেতে রাখিয়া তারে
শিখাতেন ভাল কত গল্পের ছলে,
রোদ বৃষ্টি হোক যত
বিঘ্ন বাধা কত শত
তবু হায় এ নিয়ম হত না লঙ্ঘন,
সেই কথা সেই বুলি
সেই উপদেশগুলি
আজ মোর বারে বারে হতেছে স্মরণ,
জীবনের শত ব্রত
নিজের কর্ত্তব্য যত
নীরবেতে সাধিলেন করিয়া যতন,
আমাদের শিক্ষাদাতা
দরিদ্রের পিতা মাতা
নীরব সাধক সেই নীরব জীবন,
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যানে
ব্রহ্মনাম সুধাপানে,
ব্রহ্মযোগী হইলেন ব্রহ্মেতে মগন।
আজ তাঁর অদর্শনে
মোরা কটি ভাই বোনে
শোকাহত, করিতেছি নীরবে রোদন।

কুমারী মেরীগোল্ড-
হাসিনী রায় চৌধুরী।

অন্ধের উক্তি।

শুনেছি এ বসুন্ধরা সুচারু সুন্দর,
তরু লতা ফুল ফল অতি মনোহর।
নয়নরঞ্জন পাখী, আকাশ সুনীল,
জলধির বক্ষে নীল স্ফটিক সলিল।
জানি না সে সব হায়, মধুর কেমন!
আমার আঁধারে মগ্ন সমস্ত ভুবন।
কেমন এ বসুন্ধরা, দেখিনি নয়নে,
কল্পনা অতীত সবি বিনা দরশনে।
কি পাপে এ গুরুশাস্তি বুঝিতে না পারি
তম আচ্ছাদিত মোরে করেছ মুরারি!
কেন এ পৃথিবী ঘোষে তোমার মহিমা,
পাপী যদি নাহি পায় তিল মাত্র ক্ষমা।
খুলে দাও দৃষ্টি, ওহে নিঠুর ভবেশ!
নিজ সন্তানেরে কেন এত দাও ক্লেশ?
কত দুঃখে, কত কষ্টে দিন কেটে যায়,
অন্তর্যামী তুমি প্রভো! কি বলিব হায়।
সন্তান বলিয়া তব নাহি দয়া লেশ,
ঘুচাও সকল বাধা নিঠুর ভবেশ!
নাহি তব দয়াবিন্দু, পাষাণহৃদয়,
মানবে রেখেছে নাম কেন দয়াময়?
এই ভাবে যাবে যাক্ সমস্ত জীবন
নিঠুর! অন্তিমে দিও যুগল চরণ।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন গুপ্তা।

২১১৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীগুরুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 533. January, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৩ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৪। জানুয়ারি, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিধবা বিবাহ—জষ্টিস চন্দাবরকার ও তাঁহার পত্নীর চেষ্টায় গত মাসে শ্রীযুক্ত রামরাও নামক একটী শিক্ষিত যুবকের সহিত দাক্ষিণাত্যের ম্যাঙ্গালোরের এক-সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী কাবেরীচায়ের শুভ বিবাহ হই-য়াছে। বিবাহে অনেক গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-বাসীগণ সমাজ সংস্কারে অনেক অগ্রসর হইতেছেন।

স্ত্রীজাতির অধিকার—ইংলণ্ডে এক-দল রমণী সকল বিষয়ে পুরুষদিগের তুল্য অধিকার লাভ করিবার জন্য অনেক দিন হইতে তুমুল আন্দোলন করিয়া আসিতে-ছেন। সম্প্রতি তাঁহারা পুরুষদিগের প্রণীত আইনদ্বারা স্ত্রীলোকের বিচার অবৈধ বলিয়া সকল আদালতে আন্দোলন করিতেছেন। অনেকে ইঁহাদের পক্ষ অবলম্বন [illegible]য়া ইঁহাদের ন্যায্য অধিকার [illegible] যত্নবান আছেন।

বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের গত ১৮ই ডিসেম্বর মৃত্যু হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে তিনি অনেক নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছেন।

সম্মান—উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, তাঁহার কন্যা মিস্ দাস ও কণিকার রাজা লণ্ডনের এসিয়াটীক সোসাইটীর সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্তের কন্যা এই সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন।

পীড়া—শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু দুই মাস যাবৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি-য়াছেন। তিনি শীঘ্রই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছেন। তিনি এই অসুস্থ অবস্থায়ও বামাবোধিনী এবং ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতিফণ্ডের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের

আবাস নির্ম্মাণ—যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর অভিভাবকতায় বিলাতে একটী ভারতীয় মেলা বসিবে। এই মেলার সংগৃহীত অর্থদ্বারা এডিনবরায় ভারতবাসী ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটী বাটী নির্ম্মিত হইবে। অনেক সম্ভ্রান্তমহিলা মেলায় দোকান খুলিতে স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সমিতি—ভারতীয় সমগ্র মুসলমানজাতির শিক্ষা ও সম্মিলনের সভা এবার করাচিতে বসিয়াছে। এই সভায় হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপনের প্রস্তাবটী দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "স্বদেশীর প্রাতঃকৃত্য" পুস্তকে লিখিয়াছেন;—

"কোরাণবেদ্যাদিতো জগদীশ একো-
জীবশ্চ মৃত্যুরপি বঃ সমসূত্র বদ্ধঃ।
অবৈধরক্তরসহিন্দুমহম্মদীয়াঃ!
সোদর্য্যসংহতিবলং প্রকটীকুরুধ্বম্॥
—বেদে বা কোরাণে সেই একই ঈশ্বর,
এক রক্ত-রস-ধাতু দোঁহারি ভিতর;
ভারতের হিন্দু আর মুসলমানগণে
এক সূত্রে গাঁথা দোহে জীবনে মরণে;
এস হিন্দু! মুসলমান! প্রাণের সোদর!
সোদর্য্য-একতা-শক্তি দেখাও সত্বর।"

এহেন হিন্দু মুসলমানে যাঁহারা বিচ্ছেদ ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের ন্যায় পাপিষ্ঠ আর কে আছে, জানি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার চেষ্টা—ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব কলিকাতায় আসিবার সময় গোয়ালন্দে কে তাঁহাকে গুলি করে। তিনি সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইয়াছেন এবং চিকিৎসাধীন আছেন। আসামী এখনও ধৃত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যাবাস—যক্ষ্মারোগী-দিগের চিকিৎসার্থ হিমালয় অধিত্যকা আলমোরায় একটী গৃহনির্ম্মাণের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভূমি ও ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কুমারী ডাক্তার মেরী পেলক্রোপ এই স্বাস্থ্যাবাসের ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের নিকট অবশিষ্ট ছয় হাজার টাকার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্য্যে সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনীয়।

পুরাতন বিদায় নবীন আবাহন।

ভূতরূপ সাগরেতে পুরান ডুবিল,
বিরহির প্রাণে তার আঘাত রহিল;
জীবনের কত জ্যোতি তুইরে হরিলি,
কত আনন্দের গেহে ঢালিলি কুহেলি।

পুরাতন! বন্ধু বলি করিয়ে যতন,
এতকাল দি'ছি তোরে প্রিয় সম্ভাষণ।
যাদের আলোকে ধরা ছি[illegible] হর্ষ ভরা,
সৌরভ দিতেন যারা [illegible]